সেপ্টেম্বর ২০২০ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন

স্বপ্ন সারথির অভিযাত্রা

আহনাফ কাদের, শ্রেণি নার্সারি, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

মো. আব্দুল কাদের জিলানী, শ্রেণি কেজি, টাচ্‌স্টোন স্কুল, মিরপুর, ঢাকা

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

সেপ্টেম্বর ২০২০ ❑ ভাদ্র-আশ্বিন ১৪২৭

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
মোহাম্মদ আলী সরকার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সহসম্পাদক
শাহানা আফরোজ
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

মূল্য: ২০.০০ টাকা।

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সম্পাদকীয়

শুভ জন্মদিন, শিশুদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১৯৪৭ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্ম নিয়েছিলেন আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। তিনি বাবা মায়ের বড়ো সন্তান।

বন্ধুরা, শেখ হাসিনা সবার কাছে একটি প্রিয় নাম। তাঁর বড়ো পরিচয় তিনি বাঙালির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সন্তান। সবকিছু ছাপিয়ে তিনি একজন মানবদরদি রাষ্ট্রনায়ক, একজন সুলেখক এবং সর্বোপরি তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

পঁচাত্তরে পরিবারের সকলকে হত্যা করল ঘাতকের দল। ভাগ্যক্রমে বিদেশ থাকায় বেঁচে যান শেখ হাসিনা ও তাঁর ছোটোবোন শেখ রেহানা। বিদেশ থেকে দেশে ফিরে মানুষের পাশে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর শত বাধা সত্ত্বেও প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বাবার স্বপ্ন পূরণে দেশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন তিনি।

বন্ধুরা, ২৮শে সেপ্টেম্বর আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন বাঙালির কাছে গৌরবদীপ্ত একটি ক্ষণ। জন্মদিনের শুভক্ষণে নবারুণের পক্ষ থেকে তাঁকে জানাই প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। তাঁর মতো সাহসী হও তোমরা সবাই, এই কামনা করি।

ভাদ্র এবং আশ্বিন এই দুই মাস নিয়ে শরৎকাল। যাকে আমরা ঋতুর রানি বলে জানি। এসময়ে নীল আকাশে শুভ্র তুলোর মতো মেঘের ভেলা ভেসে ভেসে যায়। বিলের জলে ফোটে পদ্ম, শাপলা, কলমিলতা, শালুকসহ আরো কত ফুল। নদীর কূলে ফোটে থোকা থোকা কাশফুল। সত্যিই কী অপরূপ দৃশ্য দেখা যায় এই সময়।

প্রতিবছর ২৪শে সেপ্টেম্বর 'মীনা দিবস' আর ৩০শে সেপ্টেম্বর 'জাতীয় কন্যাশিশু দিবস' হিসেবে পালিত হয়। মীনার মতোই স্বপ্ন দেখতে শিখুক বাংলাদেশের কন্যাশিশুরা। এই প্রত্যাশা আমাদের সবার।

সূচি

নিবন্ধ

০৩ শেখ হাসিনার জন্মদিন: স্বপ্ন সারথির অভিযাত্রা
খালেক বিন জয়েনউদদীন

১৮ শুভ্র শরতের কথা/ মেজবাউল হক

৪১ করোনা থেকে সেরে ওঠার পর করণীয়
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

৪৩ যে অঞ্চলে কখনো বৃষ্টি হয় না/ ওয়ার্দা বিনতে আমীর

৪৪ পাবনার কিশোর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ বুলগানি/
আমিরুল ইসলাম রাঙা

৪৭ দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া/শাহানা আফরোজ

৫০ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস/হাসনাত বাবুল

৫৩ মীনা দিবস/মো. জামাল উদ্দিন

৫৪ অনুপ্রেরণার নাম ছোট্ট থুনবার্গ/জান্নাতে রোজী

৫৭ দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

৫৯ অনলাইন হুইলচেয়ার দাবা টুর্নামেন্ট
মো. আবু নাছের

৬০ রেস্টুরেন্টে ঘুরছে রঙিন মাছ/জোবায়ের হোসেন

৬১ বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ

৬৩ বুদ্ধিতে ধার দাও আগস্ট ২০২০ -এর সমাধান

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: আহনাফ কাদের/মো. আব্দুল কাদের জিলানী
শেষ প্রচ্ছদ: রুহমা নাওয়ার তাবাসসুম

৫২ মো. আবদুল্লাহ

৫৮ ইরিনা হক/ মোছাঃ ফারিহা নওশিন সামিয়া

৬৪ আলিফ হক/ ইনান ইসলাম

গল্প

০৯ লক্ষ টাকার আংটি/দেলোয়ার হোসেন

১৫ বন্ধুত্ব/প্রণব মজুমদার

২৪ এক টুকরো মাংস/মনি হায়দার

৩১ এক ঝাঁক জোনাকি/আহমাদ স্বাধীন

৩৪ লুকোচুরি/ মুহসীন মোসাদ্দেক

৩৭ চারাগাছ বড়ো হয়/ সনজিত দে

৩৯ মিথির লাল চিরুনি/ সানজিদা আকতার আইরিন

৫৬ এক পা বাঁধা/মো. মাইদুল ইসলাম জনী

কবিতা

১৭ মারিশা মাহপারা/ মো. আবু বকর

৩০ সাবিত্রী রানী/ মনিরা বেগম

৪২ তুর্ন রহমান/ লাবিবা তাবাসসুম রাইসা

ভাষা দাদু

২৮ শব্দের অর্থ/তারিক মনজুর

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবিতা

২১ ছাদির হুসাইন ছাদি/ মিহির হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষ্যে কবিতা

২২ চন্দনকৃষ্ণ পাল/ নওশিনা ইসলাম

কবিতায় শরৎ

২৩ গোলাম নবী পান্না/ নূর হোসাইন গাজী/
রাকিবুল হাসান রাকিব/মো. শাহরিয়ার হোসেন

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

শেখ হাসিনার জন্মদিন
স্বপ্ন সারথির অভিযাত্রা

খালেক বিন জয়েনউদদীন

আমাদের বাংলাদেশ নদীবিধৌত একটি ব-দ্বীপ অঞ্চল। এ অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে ছোটো-বড়ো হাজারো নদী। এসব নদীর মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী ও সুরমা অন্যতম। তবে ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ইছামতি, ধলেশ্বরী, তিতাস, মধুমতি, সুগন্ধা, নরসুন্ধা, গোমতি, দুধকুমার, আত্রাই, করতোয়া, নবগন্ধা, গড়াই ও বুড়িগঙ্গার নাম আমরা সবাই জানি।

পদ্মা হিমালয়ের এক আদুরি কন্যা। আর পদ্মার আদুরি শাখার নাম মধুমতি। মধুমতির একটি শাখা পদ্মা-কুমার হয়ে সাতপাড় ও হরিদাসপুর ছুঁইয়ে গোপালগঞ্জের পশ্চিম পাশ দিয়ে মিশেছে মানিকদা থেকে আসা একটি শাখা পাটগাতিতে। আবার পাটগাতির মোহনায় মিশেছে প্রাচীন বাংলার রাজধানী কোটালীপাড়ার নদী ঘাঘোর। পূর্বে ঘাঘোর আর পশ্চিমে মধুমতি। দুই নদীর মধ্যখানে ছোট্টো একটি চর। চরটির উত্তর পাশ দিয়েও বয়ে গেছে মধুমতির একটি শাখা বাইগার।

সেকালে বাংলার জনপদ ছিল নদ-নদীতে ঘেরা। বছরের নয় মাস জলে ডুবে থাকত। বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলে তখন বসতি গড়ে ওঠেনি। ঐ যে মধুমতি ও ঘাঘোরের চর, তা ছিল জলে ডোবানো। বসবাস করত মাছ ও পাখিরা। তখন ঐ অঞ্চলের নাম

ছিল রাজগঞ্জ। শাপলা–শালুক আর পদ্ম ফুলে ঢাকা থাকত রাজগঞ্জের জলে ডোবা বিলঝিল। অনেক দূরে উঁচু এলাকায় বাস করত জেলেরা। একসময় রাজগঞ্জের ডোবা জমি ও চরগুলো চাষের উপযোগী হলো। উঁচু এলাকার মানুষ এসে বসবাস শুরু করল। রাজগঞ্জ ইতোমধ্যে গোপালগঞ্জে পরিণত হয়েছে। মধুমতি ও ঘাঘোরের চর এলাকায় মানুষ বাঁশ ও তক্তা দিয়ে টং পেতে বাসা বাঁধল। আবাদ যোগ্য হয়ে উঠল টং এলাকা। এক সময় টং থেকে টুঙ্গিপাড়া নাম হলো। মানুষের ঘরবাড়ি উঠল। পাড়া মানেই গ্রাম। সেই গ্রামের পূর্বে নদী, পশ্চিমে নদী, দক্ষিণে মধুমতি ও ঘাঘোরের মোহনা। এই মোহনাতেই পাটগাতি বন্দর। সেকালে ঐ এলাকার মানুষ স্টিমার, লঞ্চ ও নৌকায় চড়ে ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ১৪ কিলোমিটার দূরে গোপালগঞ্জ যাতায়াত করত পাটগাতি হয়ে। মূলত তাদের প্রধান বাহন ছিল নৌকা।

> খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়ানো, শীতের দিনে নদীর উষ্ণ পানিতে পা ভেজানো আমার কাছে ভীষণ রকম লোভনীয় ছিল। নদীর পানিতে জোড়া নারকেল ভাসিয়ে অথবা কলাগাছ ফেলে সাঁতার কাটা, গামছা বিছিয়ে টেংরা, পুঁটি খল্লা মাছ ধরা। বর্ষাকালে খালে অনেক কচুরিপানা ভেসে আসতো। সেই কচুরিপানা টেনে তুললে তার শেকড় থেকে বেরিয়ে আসতো কই ও বাইন মাছ। একবার একটা সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম।

সেকালে টুঙ্গিপাড়া গ্রামটি ছিল অজপাড়া গাঁ। দুটি পরিবার ছাড়া সবাই ছিল সাধারণ। মাছ ধরা ও কৃষিকাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। দুটি পরিবারের মধ্যে শেখ পরিবারটি ব্যবসা-বাণিজ্য করে বাড়িতে দালান ঘর উঠিয়ে এলাকাবাসীদের তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। কলকাতায় তাদের আড়ত ছিল। চারদিকে খ্যাতি, ধনে মানে সবার শীর্ষে। একবার নীলকর ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়ে এবং কলকাতায় মামলায় জিতে সবার মর্যাদা লাভ করল শেখ হাসিনা পরিবারের লোকেরা। টুঙ্গিপাড়ায় শেখ পরিবারের পূর্বসূরিরা তিনশো বছর আগে সোনারগাঁও থেকে এসে বসতি স্থাপন করেছিল। আর তারও দুশো বছর আগে চট্টগ্রামে এসেছিলেন শেখ পরিবারের আদি পুরুষ ইরাকি দরবেশ শেখ আউয়াল। শেখ আউয়ালের উত্তরসূরি শেখ বোরহানুদ্দীন টুঙ্গিপাড়ায় বসতি স্থাপন করে ধনে মানে খ্যাতি অর্জন করেন। এদেরই উত্তরসূরি শেখ আব্দুল হামিদের ছেলে শেখ লুৎফর রহমানের আদরের নাতনি শেখ হাসিনা। নামটিও রেখেছিলেন তিনি। যার অর্থ রূপালি অঙ্গসৌষ্ঠব, এক অর্থে রূপবতী।

আজ থেকে ৭৩ বছর আগে টুঙ্গিপাড়া কেমন ছিল? ঐ যে বললাম অজপাড়া গাঁ। চতুর্দিকে নদী, খাল-বিল আর সবুজের সমারোহ। গ্রামটি লেপ্টে ছিল শ্যামলিমায়। কাদা-মাটির পথ, বর্ষায় কেবলমাত্র নৌকা ও তালগাছের ডোঙ্গা। আর সকাল-বিকাল-দুপুরে পাখপাখালির ডাকে প্রাণ জুড়িয়ে যেত মানুষের। কাজী ও শেখেরা ছিল ধনী পরিবার। বাকিরা অতি দরিদ্র। তবে ভালোবাসা ও সম্প্রীতিতে গড়া ছিল পরিবেশ। হিন্দু-মুসলিম সবাই একত্রে বসবাস করত। যদিও শেখ হাসিনার জন্মক্ষণটা ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও ভারত-পাকিস্তানের স্বাধীনতার বছর। কিন্তু তথাকথিত স্বাধীনতার দ্বন্দ্ব-কলহ, রেষারেষি টুঙ্গিপাড়ায় পৌঁছেনি। টুঙ্গিপাড়াবাসী জেনেছিল 'ইংরেজরা ভারত ছাইড়া চইল্যা গেছে হিন্দু–মুসলমানরা স্বাধীনতা পাইছে'। তবে কাছের হিন্দু এলাকা কোটালীপাড়ার বর্ণহিন্দুরা দেশত্যাগ করেছিল। নমশুদ্ররা মাটি কামড়ে থেকে গিয়েছিল সেই ১৯৪৭ সালে।

এমনি এক পরিবেশে দাদার তোলা উত্তর ভিটিতে টিনের ঘরে শেখ হাসিনার জন্ম ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৮শে সেপ্টেম্বর। শেখ হাসিনা মা ফজিলাতুন নেছা রেনুর দ্বিতীয় সন্তান। প্রথম সন্তান (ছেলে) জন্মের

সময় মৃত্যুবরণ করেন। শেখ হাসিনা জন্মকালে বাবা শেখ মুজিব ছিলেন কলকাতায় বি.এ পরীক্ষা ও দাঙ্গা বিধ্বস্ত পরবর্তী অবস্থা এবং সদ্য স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে ব্যস্ত। শৈশবে শেখ হাসিনা গৃহ শিক্ষকের কাছে রীতি অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরে ভর্তি হন প্রপিতামহদের গড়া স্থানীয় ইশকুলে।

নিজের জন্ম নেওয়া গ্রামের স্মৃতি নিয়ে শেখ হাসিনা *স্মৃতির দখিন দুয়ার* শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন:

> আমার শৈশবের দিনগুলো ভীষণরকম স্মৃতিময়। আজ সেসব দিনের কথা যেন স্মৃতির দখিন দুয়ার খোলা পেয়ে বার বার ভেসে আসছে। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। আমার বাবার এক চাচাতো বোন, আমার চেয়ে বয়সে তিন-চার বছর বড়ো হবে। সেই ফুফুর সঙ্গে বাড়ির সব ছেলেমেয়েরা স্কুলে যাচ্ছি। খালের ওপর ছিল বাঁশের সাঁকো। সেই সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে হবে। প্রথমদিন কি দারুণ ভয় পেয়েছিলাম। আমার হাত-পা কাঁপছিল, ফুফুই আমাকে সাহস দিয়ে হাত ধরে সাঁকো পার করিয়ে দিয়েছিল। এরপর কখনও ভয় করেনি। বরং সবার আগে আমিই থাকতাম।
>
> খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সমবয়সী ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নদীর ধারে বেড়ানো, শীতের দিনে নদীর উষ্ণ পানিতে পা ভেজানো আমার কাছে ভীষণ রকম লোভনীয় ছিল। নদীর পানিতে জোড়া নারকেল ভাসিয়ে অথবা কলাগাছ ফেলে সাঁতার কাটা, গামছা বিছিয়ে টেংরা পুঁটি খল্লা মাছ ধরা। বর্ষাকালে খালে অনেক কচুরিপানা ভেসে আসতো। সেই কচুরিপানা টেনে তুললে তার শেকড় থেকে বেরিয়ে আসতো কই ও বাইন মাছ। একবার একটা সাপ দেখে খুব ভয় পেয়েছিলাম।
>
> বৈশাখে কাঁচা আম পেড়ে কুচি কুচি করে কেটে সর্ষেবাটা ও কাঁচা মরিচ মাখিয়ে, তারপর কলাপাতা কোনাকুনি করে সেই আম মাখা পুড়ে, তার রস টেনে খাওয়ার মজা ও স্বাদ আমাকে এখনও আপ্লুত করে রাখে। কলাপাতায় এই আম মাখা পুড়ে যে না খেয়েছে, সে কিছুতেই এর স্বাদ বুঝবে না। আর কলাপাতায় এ আম মাখা পুড়লে তার ঘ্রাণই হতো অন্যরকম। এভাবে আম খাওয়া নিয়ে কত মারমারি করেছি। ডাল ঝাঁকিয়ে বড়ুই পেড়ে কাড়াকাড়ি করে খেতাম। গ্রামের বড়ো তালাবের (পুকুর) পাড়ে ছিল বিরাট এক বড়ুই গাছ। ঝাঁকুনির ফলে লালের আভা লাগা সব থেকে টলটলে বড়ুইটা পুকুরের গভীর পানিতে গিয়ে পড়ত এবং কারো পক্ষে কিছুতেই সেটা যখন তুলে আনা সম্ভব হতো না, তখন সেই বড়ুইটার জন্য মন জুড়ে থাকা দুঃখটুকু এখনও ভুলতে পারলাম কই?
>
> পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে আমরা ছোট্টো ডিঙ্গি নৌকা চড়ে ঘুরে বেড়াতাম। আমার দাদার একটি বড়ো নৌকা ছিল। যার ভেতরে দুটো ঘর ছিল, জানালাও ছিল বড়ো বড়ো। নৌকার পেছনে হাল, সামনে দুই দাঁড় ছিল। নৌকার জানালায় বসে নীল আকাশ আর দূরের ঘন সবুজ গাছপালা ঘেরা গ্রাম দেখতে আমার বড়ো ভালো লাগত। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় সেই নৌকা ভেঙ্গে নষ্ট হয়ে যায়। শৈশবের ফেলে আসা সেই গ্রাম আমার কাছে এখনও যেন সুভাসিত ছবির মতো।
>
> আমার বাবার জন্মস্থানও টুঙ্গিপাড়ায়। তিনি এখন ঐ গ্রামের মাটিতেই ছায়াশীতল পরিবেশে ঘুমিয়ে আছেন। তাঁর পাশেই আমার দাদা-দাদির কবর– যারা আমার জীবনকে অফুরন্ত স্নেহমমতা দিয়ে ভরিয়ে তুলেছিলেন। আজ আমার গ্রামের মাটিতেই তারা মিশে আছে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ঘাতকের নির্মম বুলেটে আমার মা, বাবা, ভাই ও আত্মীয়পরিজন অনেককে হারাই। দেশ ও জাতি হারায় তাদের বেঁচে থাকার সকল সম্ভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বাধীন সত্তা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। ঘাতকের দল বাংলার প্রাণকেন্দ্র ঢাকা থেকে সরিয়ে সেই মহাপুরুষকে নিভৃত পল্লীর মাটিতেই কবর দিয়েছে। ইতিহাসের পাতা থেকে তাকে মুছে ফেলার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে, কিন্তু পেরেছে কি?

বাবার কাছাকাছি বেশি সময় কাটাতাম। তাঁর জীবনের ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক আলোচনা করার সুযোগও পেতাম। তার একটা কথা আজ খুব বেশি করে মনে পড়ে। তিনি প্রায়ই বলতেন 'শেষ জীবনে আমি গ্রামে থাকব। তুই আমাকে দেখবি। আমি তোর কাছেই থাকব'। কথাগুলো আমার কানে এখনও বাজে। গ্রামের নিঝুম পরিবেশে বাবার মাজারের এই পিছুটান আমি পৃথিবীর যেখানেই থাকি না কেন, আমাকে বার বার আমার গ্রামে ফিরিয়ে নিয়ে যায়।

আমি এখন নিজেকে রাজনীতির সঙ্গে নিয়েছি। দেশ ও জনগণের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করতে পেরে আমি গর্বিত। আমার জীবনের শেষ দিনগুলো আমি টুঙ্গিপাড়ায় স্থায়ীভাবে কাটাতে চাই। খুব ইচ্ছে আছে নদীর ধারে একটা ঘর তৈরি করার। আমার বাবা-মার কথা স্মৃতিকথামূলকভাবে লেখার ইচ্ছে আছে। আমার বাবা রাজনীতিবিদ মুজিবকে সবাই জানতেন। কিন্তু ব্যক্তি মুজিবও কত বিরাট হৃদয়ের ছিলেন, সেসব কথা আমি লিখতে চাই। গ্রামকে তো আমি আমার শৈশবের গ্রামের মতো করেই ফিরে পেতে চাই। কিন্তু চাইলেই তো আর হবে না। এখন সময় দ্রুত বদলাচ্ছে। যান্ত্রিকতার স্পর্শে গ্রামের সরল সাধারণ জীবনেও ব্যস্ততা বেড়েছে, চমক জেগেছে। মানুষও ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। এই শতাব্দীতে বাস করে বিজ্ঞানের আশীর্বাদকে অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর গ্রামীণ জীবনের মানোন্নয়ন ও শ্রমের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। আমাদেরও এগিয়ে যেতে হবে।

আমার শত ব্যস্ততা থাকলেও এবং একটু সময় পেলেই আমি চলে যাই। কেন যে মনে হয় আমার শৈশবের গ্রামকে যদি ফিরে পেতাম! গ্রামের মেঠোপথটা যখন দূরে কোথাও হারিয়ে যায় আমার গলা ছেড়ে গাইতে ইচ্ছে করে, গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙ্গা মাটির পথ, আমার মন ভোলায় রে...।' শৈশব ও কৈশোরের স্কুলপাঠ্য বইয়ের গ্রাম সম্পর্কিত কবিতাগুলো আমার খুব সহজেই মুখস্থ হয়ে যেতো। আমাদের ছোটো গাঁয়ে ছোটো ছোটো ঘর', 'তুমি যাবে ভাই যাবে মোর সাথে আমাদের ছোটো গাঁয়', 'বহুদিন পরে মনে পড়ে আজ পল্লী মায়ের কোল', 'বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ঐ', 'মেঘনা পারের ছেলে আমি', 'ছিপখান তিন দাঁড়, তিনজন মাল্লা', 'তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে' এসব কবিতার লাইন এখনও মনে আছে।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বর্ণদ্বারে পাঠিকা হিসেবে যখন আমি প্রবেশ করি, তখন তো আমি কিশোরী। পরে হয়েছিলাম ছাত্রী। গ্রামভিত্তিক উপন্যাস, গল্প ও কবিতা যখনই সুযোগ পেয়েছি পড়েছি। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী' আমাকে প্রথম ভীষণভাবে আচ্ছন্ন করে। এখনও হাতের কাছে পেলে পাতা ওল্টাই। দুর্গা ও অপু দু'ভাই-বোনের ভালোবাসা, স্নেহমমতা, খুনসুটি, গ্রামময় ঘুরে বেড়ানো, কিছু পেলে ভাগাভাগি করে খাওয়া, অপুর প্রতি দুর্গার কর্তব্যবোধ, দুর্গার অসুখ ও মৃত্যু। অপুর দুঃখ ও দিদিকে হারানোর বেদনা, বুড়ি ঠাকুরমার অভিমান, দুঃখ-ব্যথা, অসহায়ত্ব। অপুর মা সর্বজয়া, দুঃখ-দারিদ্র্য যার নিত্যসঙ্গী, জীবনের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যার সংগ্রাম, সন্তানদের প্রতি স্নেহ-মমতা। অপু-দুর্গার বাবার প্রবাস চাকরি জীবন, দুর্গার মৃত্যুর পর তার জন্য বাবার আনা শাড়ি, এসব ছোট্টো ছোট্টো দুঃসময় বাস্তব জীবনের বহু খণ্ড খণ্ড চিত্র তো বাংলাদেশের গ্রাম জুড়ে আজও রয়েছে। 'পথের পাঁচালী' আমার নিজের গ্রামকেই মনে করিয়ে দেয়। বাংলা সাহিত্যে 'পথের পাঁচালী' শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। রবীন্দ্রনাথের গ্রামভিত্তিক ছোটোগল্পগুলোও আমার ভীষণ প্রিয়। গ্রামকে নিয়ে শিল্পী জয়নুল আবেদিনের স্কেচগুলোও বাস্তব। কলাগাছের ঝোপে নোলক পরা বউয়ের ছবিটি এখনও মনে পড়ে। আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও মোটেই অনুল্লেখ করার মতো নয়। বাউল গান, বৈষ্ণব গান, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি মাঝির গান এসবই আবহমান কালের গৌরব।

গ্রামই আমাদের জীবন। আলোকোজ্জ্বল আধুনিক রাজধানী ও শহরকে বাঁচিয়ে রাখছে গ্রামীণ অর্থনীতি আর মানুষ। ছোটো-বড়ো সব গ্রামকেই আমাদের ঐতিহ্য অনুসারী আধুনিক ও আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

পাঁচ বছর বয়সে শেখ হাসিনা বন্দি বাবাকে দেখার জন্য সেই ১৯৫২ সালে দাদা-দাদির সাথে নিজেদের পানসি নৌকায় চড়ে ঢাকা আসেন। দুর্ভাগ্য বাবাকে দেখতে পারেননি। ১৯৫৪ সালে শেখ হাসিনা ঢাকার স্থায়ী বাসিন্দা হন মা-বাবার সাথে। ইতোমধ্যে চুয়ান্নর নির্বাচনের জয়ে শেখ মুজিব জিতে মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

ঢাকায় এসে শেখ হাসিনা প্রথমে ১৯৫৬ সালে ভর্তি হন নারী শিক্ষা মন্দিরে বর্তমান এটির নাম শেরেবাংলা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়। ১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কের ৬৭৭ নম্বর বাড়িতে ওঠেন। তখন তাঁর ইশকুল বদলাতে হয়। নতুন করে ভর্তি হন আজিমপুর বালিকা বিদ্যালয়ে। এই বিদ্যালয় থেকে তিনি ১৯৬৫ সালে এসএসসি পাস করেন। পরে ভর্তি হন বদরুন্নেসা সরকারি মহাবিদ্যালয়ে। ১৯৬৭ সালে এই কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। ১৯৬৭ সালেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৭৩ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। স্বামী পরমাণু বিজ্ঞানী এম এ ওয়াজেদ মিয়ার সাথে সন্তান ও ছোটো বোনটিকে নিয়ে জার্মানিতে যান ১৯৭৫ সালের কালরাত্রির ১৭ দিন আগে। তারপর পরবর্তী ছয়টি বছর তাদের লন্ডন ও দিল্লিতে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। ১৯৮১ সালে ফিরে আসেন স্বদেশে এবং পুরোপুরি দেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। আজ তিনি দেশের জনগণের কল্যাণে ২৪ ঘণ্টা নিরন্তর নিয়োজিত।

শেখ হাসিনার জন্মদিন ২৮শে সেপ্টেম্বর। ঘটা করে জন্মদিন পালন আদৌ পছন্দ করেন না তিনি। যদিও জন্মদিন পালন এখন রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। তবে বিখ্যাত ও দেশের জন্য নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিদের জন্মদিনে শ্রদ্ধা ও স্মরণ করা কর্তব্য মনে করেন। এ কারণে জাতির পিতার জন্মশত বছরের দিনটি স্মরণীয় করে রাখার জন্য বিশেষ আয়োজন ও পরিকল্পনা করা হয়। আবার প্রতিকূল পরিবেশের কারণে তিনি তা স্থগিত করেছেন। শিশু-কিশোর ভাইবোনদের তিনি প্রচণ্ড ভালোবাসেন। সেই কৈশোরে বাবাকে বলে দাদাভাইয়ের কচিকাঁচার আসরে ভর্তি হয়েছিলেন। জাতীয় শিশু দিবসে মেলার কার্যক্রমে উপস্থিত হয়ে অংশ নিয়েছেন। শিশুদের অধিকার রক্ষায় জাতীয় শিশুনীতি ঘোষণা করেছেন। আর ইশকুল পড়ুয়া ভাইবোনদের জন্য বিনা বেতন, বৃত্তি, বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রদান ও টিফিনের যোগান তাঁর একান্ত আগ্রহে প্রবর্তন করা হয়েছে। পাশাপাশি শিশুর স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। কত শিশু-কিশোর তাঁর দয়ালু হাতের ছোঁয়া পেয়েছে, তা ইয়ত্তা নেই।

আল্লাহ সহায় বলে আজো শেখ হাসিনা এই বাংলার মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। তিনি একাত্তর ও পঁচাত্তরের খুনিদের বিচার করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন সংবিধানে। আমরা এখন মধ্যম আয়ের দেশের বাসিন্দা। মূলত আমাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের তিনি একমাত্র কাণ্ডারি। সময় পেলেই লেখালেখি করেন। তাঁর অনেকগুলো বই প্রকাশিত হয়েছে। গোটা বিশ্ব তাঁকে নানাভাবে সম্মানিত করেছে। এটা দেশ ও জাতির জন্য গৌরবের। বঙ্গবন্ধু জীবদ্দশায় সোনার বাংলা গড়ার যে স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং আমরা যে স্বপ্ন আঁকি, তা পূরণের জন্য সর্বদা ব্যস্ত থাকেন শেখ হাসিনা। তাঁর মমতাময়ী মুখ আমাদের বেঁচে থাকার পথ দেখায়। তাঁর দীঘল আঁচলের ছায়ায় সমগ্র বাংলার ঘর-গেরস্থি। তাঁর সাদামাটা জীবনযাপন গ্রামবাংলার সাধারণ পরিবারের মেয়ের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। তাঁর ৭৪তম জন্মদিন আমাদের কাছে আনন্দের। আল্লাহর কাছে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করি। আমাদের স্বপ্ন স্বারথির অভিযাত্রা সুগম হোক। ■

লক্ষ টাকার আংটি

দেলোয়ার হোসেন

আরিফ সাহেব বাইরে থেকে এসে ঘরে ঢুকতেই তার মা বললেন, একটু আগেই তোর ফোন এসেছিল। আরিফ সাহেব বললেন, যার প্রয়োজন সে হয়ত আবারও করবে। কথাটি বলতে বলতেই টেলিফোন বেজে উঠল।

– হ্যালো।

অপর প্রান্ত থেকে কেউ বলল, আমি বাদশা মিয়া বলছি। আমাদের বাবা রুস্তম আলি আজ সকাল আটটার দিকে মারা গেছেন। তবে বাবার আঙুলে একটি দামি আংটি ছিল সেটা চুরি হয়ে গেছে। আংটি-টা ছিল আমাদের পরিবারের সৌভাগ্যের প্রতীক। এটা আপনাকে উদ্ধার করে দিতে হবে। না- না, তার জন্য আপনাকে উপযুক্ত সম্মানী দেওয়া হবে।

আরিফ সাহেব বললেন, আপনার বাবাকে চিনতাম ও জানতাম। তার সাথে বেশ কয়েকবার আমার দেখা হয়েছে এবং কথাও হয়েছে। আমি অবশ্যই আসব। তবে একটি কথা আগেই জেনে নেওয়া ভালো। এই চুরির ব্যাপারে কাউকে সন্দেহ হয় আপনার?

– কাকে সন্দেহ করব। আসলে বাবাকে নিয়ে সবাই এত ব্যস্ত ছিলাম যে, আংটির কথা ভাবার মতো অবস্থা ছিল না আমাদের।

– প্রথমে কে খেয়াল করল যে, আংটি-টা নেই?

– আমার ছোটো ভাই জাহাঙ্গীর।

– আপনার মা কী বলেন?

– মা বেশি ভেঙে পড়েছেন। বার বার লাশের পাশে তিনি জ্ঞান হারিয়েছেন। এই সৌভাগ্যের আংটি-টা আমার নানা ভাই দিয়েছিলেন আমার বাবাকে।

– ঠিক আছে, আমি আসছি।

আরিফ সাহেব একজন নামকরা গোয়েন্দা; বহু জটিল কেস তার হাতে এসেছে। তিনি সুক্ষ্ম বুদ্ধি খাঁটিয়ে সব কেসের সমাধানও করেছেন।

এখানে রুস্তম আলি ও সৌভাগ্যের আংটি-টা কোথা থেকে এল, সে বিষয়ে একটু আলোকপাত করা প্রয়োজন।

সবেদ আলির একমাত্র ছেলে রুস্তম আলি। ছেলেটি দারুণ চটপটে আর দেখতেও সুন্দর। রুস্তমের বয়স যখন ষোলো/ সতেরো তখন একদিন বাবার সাথে তার কথা কাটাকাটি হয়। ছেলে অভিমান করে কাউকে কিছু না বলে নিরুদ্দেশে চলে যায়। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পকেট ভরে টাকাপয়সাও নিয়ে যায়।

সবেদ আলি নিজের ভুল বুঝতে পেরে প্রথমে আত্মীয়স্বজন ও রুস্তমের বন্ধুদের বাড়িতে খোঁজখবর করে। কিন্তু কেউ রুস্তম আলির সন্ধান দিতে পারে না। এভাবেই এক মাস কেটে যায়। রুস্তম আলির বাবা-মা একমাত্র ছেলের শোকে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হওয়ার জোগাড়। সবেদ আলি নামাজ শেষে আল্লাহর কাছে এই প্রার্থনা করে– হে আল্লাহ আমার ছেলেকে ফিরিয়ে এনে দাও। আমি আর কখনো ওর মনে আঘাত দেব না। এভাবেই চলতে চলতে হঠাৎ একদিন চিঠি এল সবেদ আলির নামে। রুস্তম আলি লিখেছে, বাবা আমি এখন ইরান দেশে আছি। একজন সওদাগর আমাকে নিয়ে এসেছে। আমি ভালো আছি। আমার জন্য চিন্তা করো না। মাকে আমার সালাম দিও। দোয়া করতে বলো।

চিঠিতে রুস্তম আলি কোনো ঠিকানা দেয়নি। ফলে, সবেদ আলি ছেলের সাথে আর যোগাযোগ করতে পারল না। তবু আশায়-আশায় দিন কাটে বাবা-মায়ের। সবেদ আলি ভাবে, ছেলে যেখানেই থাক– ভালো থাক। একদিন না একদিন সে নিশ্চয়ই দেশে ফিরে আসবে।

তো সত্যি একদিন রুস্তম আলি দেশে ফিরে এল। তবে আট বছর পর। এর মধ্যেই সবেদ আলি এ দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে পরপারে। রুস্তম আলি অবশ্য একা আসে নাই– সঙ্গে এসেছে তার স্ত্রী গুলনাহার।

রুস্তম আলি সেদিন কথা কাটাকাটির পর রাগের মাথায় বর্ডার পার হয়ে চলে গিয়েছিল ভারতে। সেখানে দু-দিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একটা মার্কেটের সামনে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। আসামের এক পাথর ব্যবসায়ী অদূরেই বসেছিলেন। এই দৃশ্য দেখে তিনি ছুটে যান ছেলেটির কাছে। তারপর ছেলেটিকে সুস্থ করে একথা-সেকথা জিজ্ঞাসা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে তিনি বললেন, তুমি কি আমার সাথে যেতে চাও? আমি অনেকগুলো দেশ ঘুরব। আমি দেশে দেশে ঘুরে পাথর বেচাকেনা করি। আমার বাড়ি আসামে।

রুস্তম আলি লোকটার ব্যবহারে ও আন্তরিকতায় খুব খুশি। তার সঙ্গে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়ানোর কথা শুনে সে মনে মনে ভাবল, এমন সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না। আল্লাহ যা করেন তা– মানুষের ভালোর জন্যই করেন। রুস্তম আলি সওদাগরের কথায় রাজি হয়ে গেল। সওদাগর পাকিস্তান, আফগানিস্তান হয়ে চলে গেলেন ইরানে। সঙ্গে রুস্তম আলি। কিছুদিন ইরানে থাকার পর সওদাগর রুস্তম আলিকে নিয়ে ফিরে আসেন আসামে।

সওদাগরের একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ছেলেটিই বাবার ব্যাবসা সামলায়। মেয়েটি খুবই সুন্দরী। নাম গুলনাহার। গুলনাহার উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী। সে এক সময় এস.এস.সি পাস করে। কিন্তু বাবা তাকে কলেজে ভর্তি না করে বাড়িতেই রাখেন। তাকে ধর্মের প্রতি আরো মনোনিবেশ করতে বলেন। গুলনাহার নিয়মিত নামাজ পড়ে। এদিকে সওদাগরের সাথে চলতে ফিরতে রুস্তম আলি দাড়ি রেখে নামাজ রোজার প্রতি মন দিয়েছে। তার এমন পরিবর্তনে সওদাগর খুব খুশি। তিনি মনে মনে ভাবেন, এমন একটি ছেলেই আমি খুঁজছিলাম। রুস্তম আলি দেখতে যেমন সুন্দর তার আচার-ব্যবহারও তেমন সুন্দর।

একদিন সওদাগর রুস্তম আলিকে একটি ঘরে ডেকে নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনার পর বললেন, আমি মনে মনে ভেবেছি– আমার মেয়ে গুলনাহারের সাথে তোমার শাদী দিয়ে তোমাকে এখানেই রাখব। যদি তুমি রাজি হও। রুস্তম আলি বলল, আপনি হয়ত আমার ভালোর জন্যই এমন চিন্তা করেছেন– তবে এ ব্যাপারে আমি একটু চিন্তা করতে চাই। সওদাগর বললেন, ঠিক আছে বাবা, তুমি ভেবেই আমাকে বলো। আমি তোমার উপর জোর করছি না। তোমার বাড়ি বাংলাদেশে এবং তোমাকে আমার ভালো লেগেছে। তোমার কাছে আমার গুলনাহার সুখে থাকবে এ আমার বিশ্বাস।

এক সপ্তাহ পর রুস্তম আলি সওদাগরকে বলল, আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কিছু বলার নেই। তবে আমার একটা আর্জি আছে। সওদাগর খুশিমনে হাসতে হাসতে বললেন, বেশ তো বলো কী তোমার আর্জি।

– আমার বাবার সম্পদের অভাব নেই। আমি তাদের একমাত্র সন্তান। বহুদিন হয় বাড়ির কোনো খবর রাখি না। তবে আমি শাদী করে গুলনাহারকে সঙ্গে নিয়ে দেশে যেতে চাই এবং দেশেই ব্যাবসা-বাণিজ্য করতে চাই।

– তোমার কথায় আমি খুব খুশি হলাম। কেননা মেয়েদের শান্তির স্থানই স্বামীর বাড়ি। তোমাদের সঙ্গে আমিও গিয়ে একবার দেখে আসব।

অল্পদিনের মধ্যেই রুস্তম আলির বিয়ে হয়ে গেল। একদিন সওদাগর তার চামড়ার ব্যাগ থেকে অনেকগুলো দামি পাথর বের করলেন। তারপর রুস্তম আলিকে ডেকে পাথরগুলো এক এক করে তার আঙুলে ছোঁয়াতে লাগলেন।

কাণ্ড দেখে রুস্তম আলি বলল, এটা আপনি কী করছেন? সওদাগর বললেন, আমি দেখছি কোন পাথরটা তোমার সৌভাগ্য এনে দেবে। হঠাৎ একটা ধূসর পাথর আঙুলে ছোঁয়ানো মাত্রই তার রং পালটাতে শুরু করল। দেখতে দেখতে পাথরটা লাল হয়ে গেল। আর রুস্তম আলিও যেন একটু শিউরে উঠল।

সওদাগর বললেন, এই পাথরটি তোমার সৌভাগ্যের প্রতীক। এটা আমি রুপা দিয়ে বাঁধিয়ে, বিস্‌মিল্লাহ বলে তোমার ডান হাতের মাঝের আঙুলে পরিয়ে দেব। তারপর তুমি যে কাজে হাত দেবে সেখানেই উন্নতি দেখতে পাবে। তবে অপবিত্র অবস্থায় হাতে রাখবে না। খুলে রাখলেও বিস্‌মিল্লাহ বলে হাতে পরবে।

আশ্বিন মাসের প্রথমেই তিনজন মানুষ বাংলাদেশের কমলাপুর গ্রামে এসে পৌঁছালো। প্রাইভেট কার থেকে নামার আগেই পাড়ার মানুষ এসে ভিঁড় জমালো। অনেকেই খবর নিয়ে গেল বাড়ির মধ্যে। রুস্তম আলির মা পাগলের মতো ছুটে এলেন। কই, কোথায় আমার রুস্তম? রুস্তম আলি এগিয়ে গিয়ে মাকে সালাম করল। বউকে বলল, আমার মা সালাম করো। রুস্তম আলি বলল– মা, বাবা কোথায়?

রুস্তম আলির মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। লোকজন বলল, তুমি চলে যাওয়ার পর চাচা দিনরাত কাঁদতেন। গত বছর তিনি মারা গেছেন। চাচা তোমার উপর কোনো রাগ রাখেননি। কখনো বদদোয়া করে নাই। সে প্রায়ই বলত, আমার রুস্তম ইরান দেশে আছে। যেখানেই থাক– সে যেন ভালো থাকে।

পাড়ার মানুষ, গাঁয়ের মানুষ সকলেই রুস্তমের বউ দেখে ধন্য ধন্য করতে লাগল। সওদাগরের সাথে আলাপ করল গাঁয়ের মানুষ। রুস্তমের আত্মীয়স্বজনেরা বলল, আল্লাহর লীলাখেলা বুঝা বড়ো ভার। তবে আমাদের রুস্তম আলি আপনার হাতে পড়েছিল বলেই আজ ফিরে আসতে পেরেছে।

রুস্তম আলির শ্বশুর আজ যাই, কাল যাই করে তাকে প্রায় দু'মাসের বেশি থাকতে হয় জামাই বাড়িতে। এর মধ্যে রুস্তম আলির বাবার অবর্তমানে ওর বড়ো মামা দু'খানা জমির নকল দলিল করে নিয়েছে। মায়ের কাছে সব শুনে একদিন রুস্তম তার মামাকে বলল। যদি ভালো চাও তো ঐ নকল দলিল ছিঁড়ে ফেলো। তা না হলে কেস করে তোমাকে জেলের ঘানি টানাবো। আর যাকে দিয়ে এই অন্যায় কাজ করিয়েছ সে কখনো তোমার পক্ষে কথা বলবে না। এটা তুমি জেনে রাখো। এদিকে সওদাগর জামাই বাড়ির চারদিকে ওয়াল করে চারতলা বিল্ডিং– এর কাজ শুরু করলেন।

বাড়ির কাজ শেষ করে একদিন সওদাগর চলে গেলেন আসামে। হঠাৎ রুস্তম আলির মামা এসে ভাগিনাকে বলল, রুস্তম একটা কথা বলার ছিল।

– বলো কী বলতে চাও।

– তুই বিদেশবিভুঁইয়ে চলে গেলি আর ফেরার নাম নিলি না। কোনো খবরও আমরা জানতে পারলাম না। এর মধ্যে তোর বাবা মারা গেল। তখনই আমার মনে শয়তান এসে বাসা বাঁধল। তোদের এত জমিজমা কে দেখবে, কে খাবে– এসব কথা ভেবে আমি অন্যায়টা করে ফেলেছি। এখন তুই ফিরে এসেছিস তাই ঐ জমি আর নিতে চাই না। এই দলিল তুই নিজের হাতে ছিঁড়ে ফেল।

মামার এই পরিবর্তন দেখে খুব খুশি হলো রুস্তম। সে বলল, মামা ওটা তুমি ছিঁড়ে ফেলো। আর তোমার কখনো কিছু চাওয়ার থাকলে আমাকে বলো। তোমরাই তো আমার আপনজন। আমি ব্যাবসা করব। উপজেলায় দোকান হবে, বড়ো হোটেল করব। তখন আমার লোক লাগবে। হোটেল পরিচালনার ভার আমি তোমাকে দেব।

একদিন কিছু হিরা আর দামি দামি পাথর নিয়ে রুস্তম আলি গেল শহরে। সেগুলো বেশ চড়া দামে বিক্রি করে ফিরে এল বাড়িতে। তারপর এক বছরের মধ্যে হোটেল করল, বাজারে তিনটি দোকান নিল। ঢাকা, খুলনা ও কুষ্টিয়া থেকে বিভিন্ন ধরনের মাল এনে সাজালো দোকান ঘর। গাঁয়ের অনেক বেকার ছেলেদের কাজ দিলো। এর মধ্যেই রুস্তম আলির ঘর আলো করে জন্ম নিল এক ছেলে। বাড়িতে, ঘরে, বাইরে কাজের

লোক। গুলনাহার মনের সুখে ঘর করছে। তার বাবাও সময় পেলেই ছুটে আসেন মেয়েকে দেখতে।

এরপর তিন ছেলে হলো রুস্তম আলির। ছেলেরা পড়ালেখা শিখে অনেক বড়ো মাপের মানুষ হলো। একদিন ধুমধাম করে বড়ো ছেলের বিয়ে দিলো রুস্তম আলি। এর মধ্যেই আসাম থেকে খবর এল সওদাগর সাহেব মারা গেছেন। রুস্তম আলি গুলনাহারকে সঙ্গে নিয়ে ছুটে গেল আসামে। তার পরের বছর তার মা মারা গেলেন। মনটা কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়ল রুস্তম আলির। অবশ্য সেও এখন বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে।

রুস্তম আলি ভাবল, সব ছেলেদের বিয়ে-শাদি হয়ে গেলে একটা বাড়িতে ওদের থাকা সম্ভব হবে না। বাড়ির পাশে জমি পড়ে আছে। সেখানে আর একটা বিল্ডিং করা প্রয়োজন। বিল্ডিং এর কাজ শেষ করে গুলনাহারকে নিয়ে হজে যাব। আল্লাহ যেন ততদিন আমাকে বাঁচিয়ে রাখেন।

দিন পনেরো পরেই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হলো। বাড়ির কাজ শেষ হওয়ার পূর্বেই রুস্তম আলির নাতি জন্মালো। সে হলো দাদা। নাতিকে পেয়ে গুলনাহার দারুণ খুশি। সব গুছিয়ে রুস্তম আলি হজ করতে গেল মক্কা শরীফে। হজ করে ফিরে আসার ছয় বছর পর মৃত্যুমুখে পতিত হলো রুস্তম আলি। মৃত্যুর পর রুস্তম আলির ছোটো ছেলে জাহাঙ্গীর খেয়াল করল তার বাবার হাতে যে আংটিটা ছিল সেটা নেই। যে আংটিটা ছিল তাদের সৌভাগ্যের প্রতীক। গুলনাহার একথা শুনে হায় হায় করে উঠল। এতদিন অবশ্য কেউ ভাবেনি রুস্তম আলির মৃত্যুর পর আংটিটা কার কাছে থাকবে। এ নিয়ে কারোর মাথাব্যথাও ছিল না।

আংটির ব্যাপারে বড়ো ছেলে বাদশা মিয়া উপজেলার গোয়েন্দা আরিফ সাহেবকে ফোন করে জানায় ঘটনাটা। বেলা একটার দিকে গাড়ি করে আসেন আরিফ সাহেব। তিনি গাড়ি থেকে নামতেই ছুটে এল রুস্তম আলির বড়ো ছেলে বাদশা মিয়া। শোকাচ্ছন্ন বাড়ি। শোকের ছায়া লেগে আছে সবার চোখে-মুখে। গোয়েন্দা আরিফ সাহেব বললেন, এ ব্যাপারে থানায় জানিয়েছেন? বাদশা মিয়া বলল, না। আমরা চাই না পুলিশ এসে বাড়ির সব লোককে জেরা করুক, লোকজনেরা খারাপ বলবে আমাদের। আপনি কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে করতে পারেন। তবে আংটির কথা বলবেন না।

– ঠিক আছে। চলুন কোনো একটা নিরিবিলি জায়গায় বসা যাক। বিষয়টা নিয়ে কিছু জানার আছে আমার।

– চলুন নতুন বিল্ডিং–এ গিয়ে বসি। ওদিকে এতটা ভিড় নেই মানুষের।

বাদশা মিয়া আরিফ সাহেবকে নিয়ে দোতলার একটি ঘরে গিয়ে বসল। আরিফ সাহেব বললেন, এবার ঘটনাটা বলুন। কখন আপনার বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তারপর কী করা হয়? বাদশা মিয়া বলল, বেলা নয়টার দিকে বাবা বুকে ব্যথা অনুভব করেন তখন মা এবং আমার সাত বছরের ছেলে জাহিদ চিৎকার করে বলে দাদু যেন কেমন করছে, তোমরা সবাই দাদুর কাছে আসো। একথা শুনে আমরা ছুটে আসি আর বাবাকে গাড়ি করে হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই ডাক্তার সাহেব বললেন, রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হলো না, উনি মারা গেছেন।

আরিফ সাহেব বললেন, তখন আপনার বাবার সঙ্গে কে ছিলেন?

– আমি আর আমার ছোটো ভাই জাহাঙ্গীর।

তখনই হাসপাতালে ছুটে গেলেন আরিফ সাহেব। যে দুইজন নার্স রোগীর কাছে ছিল তাদের ডেকে বললেন, রুস্তম আলি নামে যে হার্টের রোগী এসেছিল তার সাথে কে কে ছিল?

– তার দুই ছেলে ছিল।

– রোগীর হাতে পাথর বসানো আংটি দেখেছিলেন?

– হ্যাঁ দেখেছিলাম।

আরিফ সাহেব ফিরে এসে একটা রুমে ঢুকলেন।

যেখানে রুস্তম আলির স্ত্রী আর তার মেজো ছেলে অবস্থান করছে। আরিফ সাহেব মেজো ছেলে সুলতানকে বললেন, আপনি কতক্ষণ এখানে আছেন? মেজো ছেলে বলল, অনেকক্ষণ।

– একাই ছিলেন?

– প্রথমে একাই ছিলাম– তারপর মা আসেন।

– আপনার বাবার হাতে আংটি দেখেছিলেন?

– খেয়াল করিনি। পরে মা বলল, তোর বাবার হাতের আংটিটা গেল কোথায়– কে নিল সেটা? এই বলে মা কাঁদতে কাঁদতে অজ্ঞান হয়ে যায়। তারপর আমার বড়ো ভাই আর ছোটো ভাইও আসে এ ঘরে।

– লাশ এখানে আনার পর ছোটো ভাই কী এখানে এসেছিল?

– হ্যাঁ একবার এসেছিল।

– গোসল করানোর সময় কে কে ছিল?

– আমি ছিলাম আর পাড়ার দু-চারজন ছিল।

– তখন কী তার আঙুলে আংটি ছিল?

– না। আমি ভাবলাম কেউ হয়ত খুলে রেখেছে। এরমধ্যেই লাশ কবর দেওয়া হয়।

তারপর আরিফ সাহেব তিন ভাইকে এক ঘরে নিয়ে বললেন, আংটিটা ঘরেই আছে এবং সে খবর তিন ভাইয়ের এক ভাই জানে। আমি পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি এর মধ্যেই আংটিটা আপনাদের হাজির করতে হবে। সেটা আমি আপনাদের মায়ের হাতে তুলে দিতে চাই। তারপর উনি সেটা যাকে দেবেন সেই হবে আংটিটার মালিক।

সবাই পাঁচ মিনিটের জন্য সেই ঘর থেকে চলে গেল। বড়ো ছেলে তার মায়ের ঘরে গেল। ছোটো ছেলে মন খারাপ করে উপরের ঘরে গিয়ে বসল। আর মেজো ছেলে গিয়ে তার স্ত্রীকে বলল, গোয়েন্দা যে কার ঘাড়ে দোষ চাপাবে তাই ভাবছি।

পাঁচ মিনিট পর সবাই আবার সেই ঘরে হাজির হলো। সবাই বলল, আপনি বিশ্বাস করুন আংটিটা কোথায় কে নিয়েছে তা- জানি না। তবে সেটা খুঁজে পাওয়া খুবই প্রয়োজন। তখনই বাদশা মিয়ার ছেলে জাহিদ ঘরে ঢুকল। সে কিছুক্ষণ সবার কথা শুনল। তারপর সে বলল, আংটিটা কোথায় আছে তা আমি জানি।

কথা শুনে সবাই চমকে উঠল। জাহাঙ্গীর বলল, জাহিদ তোমার দাদুর আংটিটা কী তাহলে তুমি নিয়েছ?

– না আমি নেইনি। কিন্তু আমি জানি সেটা কোথায় আছে।

আরিফ সাহেব বললেন, আংটিটা কোথায় আছে বলো তো বাবু? জাহিদ বলল, দাদির আঁচলে বাঁধা আছে।

– তাহলে কী তোমার দাদি দাদার আঙুল থেকে খুলে আঁচলে বেঁধে রেখেছেন?

– না। অন্য একজন চুপিচুপি দাদির আঁচলে বেঁধে দিয়েছে।

– কে সে?

– তার নাম আমি বলব না।

তখন সবাই গেল রুস্তম আলির স্ত্রীর ঘরে। জাহিদ তার দাদির আঁচল থেকে আংটিটা বের করল। আরিফ সাহেব সেটা হাতে নিয়ে বললেন, খালাম্মা এই যে আপনার স্বামীর আঙুলের আংটি। এটার মালিক আপনি। তবে, এই আংটিটা আপনি অন্য কাউকে দিতে পারেন। যাকে দিবেন সে এর মালিক হবে।

জাহিদের দাদি বললেন, যে এই আংটি আবিষ্কার করতে পেরেছে, এটা আমি তাকেই দেব। আজ থেকে এর মালিক আমার দাদা ভাই। আমার আঁচলে যেই বেঁধে দিক না কেন তা নিয়ে গোল পাকানোর প্রয়োজন নেই। আংটিটা পাওয়া গেছে সেটাই হলো বড়ো কথা। ■

বন্ধুত্ব

প্রণব মজুমদার

- আউট আউট! না না তুমি আউট বাবা! বলটা তোমার পায়ের মাঝখানে লেগেছে। পা-টা মাঝ স্ট্যাম্প বরাবর ছিল! জৈয়িতা বল ছুঁড়ে মেরেছে। বাবার পায়ে লেগেছে তা! বোলার জৈয়িতার এল বি ডব্লিউ-র উচ্চকিত আবেদন!

বাবা মেনে নিলেন! তাই ব্যাট দিলেন কন্যাকে। উইকেট কিপার তামিম। আম্পায়ার নেই। তাই নিজেরাই বিচারক। খেলার নিয়ম নিজেরাই ঠিক করে নিয়েছে। পালাক্রমে ব্যাট করবে বাবা, জৈয়িতা ও তামিম। যে আউট করবে সে ব্যাট পাবে। উইকেট রক্ষকের ক্ষেত্রেও তাই।

বাংলোর ভিতরে তিনজন মিলে ক্রিকেট খেলছে। জৈয়িতা ও তামিমের বার্ষিক পরীক্ষা নভেম্বরে শেষ হয়েছে। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে ফলাফল ঘোষণা

হবে। তাই ছুটিতে ওরা পরিবারের ৭ জন মিলে ঢাকা থেকে রাঙামাটি বেড়াতে এসেছে। জৈয়িতা, মা হেনা, বাবা অনীক ভট্টাচার্য, তামিম, মা শাহিদা ইসলাম, বাবা খোন্দকার মহিতুল ইসলাম এবং জৈয়িতাদের গাড়িচালক আবুল কাশেম রানা। আন্তরিক দুই পরিবারের রাঙামাটি ভ্রমণের পরিকল্পনা দু-মাস আগেই ঠিক করা ছিল। জৈয়িতার বাবার বন্ধু রাঙামাটি জেলার অতিরিক্ত (রাজস্ব) জেলা প্রশাসক। সেই সুবাদে সরকারি এই বাংলোর অতিথি হয়েছেন তারা।

জৈয়িতার বাবা সাংবাদিক, মা ব্যাংকার। তামিমের বাবা কবি নজরুল সরকারি মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক। মা এনজিও কর্মকর্তা। উভয় পরিবারের বাস গোপীবাগে। একই বিল্ডিংয়ে পাশাপাশি ফ্ল্যাটে থাকে ওরা। দু'জন একই স্কুলে পড়ে। ফুলকুঁড়ি শিশু নিকেতনের তৃতীয় শ্রেণির শিক্ষার্থী ওরা!

কদিন ধরেই ওদের মধ্যে তেমন কথাবার্তা নেই! অথচ জৈয়িতা বেশ বাকপটু! ঢাকা থেকে এখানে আসার সময় সারাটা ক্ষণই ও বাবার সঙ্গে কাটিয়েছে। বাবা জানতে চাইলেন কেন কথা বলছে না সে তামিমের সঙ্গে। জৈয়িতার উত্তর ওর সঙ্গে এমনি এমনি কাট্টি দেইনি বাবা।

- কেন এমন নির্দয় আচরণ ওর সঙ্গে বলো?

- এই যে দেখো জিপের সিট কভার! এটা টানলে গাড়িটা কষ্ট পায় না বুঝি ? তামিমকে কতবার বলেছি তুমি আমার চুল ধরে টানবে না! কান ধরবে না! ও কারো কথা শোনে বাবা? এখানে আসার আগের দিন সকালে ও আমার চুল ধরে মাটিতে ফেলে দেয়! ওকে কিছুই বলিনি। তাই ওর সঙ্গে আড়ি!

- বেড়াতে এসে রাগ রাখতে নেই মা! বন্ধুর সঙ্গে আড়ি দেওয়া ভালো নয়। বিপদে সত্যিকার বন্ধুরাই রক্ষা করে। ও ভালো বন্ধু তোমার।

বাবা-মেয়ের কথা যখন হচ্ছিল তখন মায়ের কোলে ঘুমাচ্ছিল তামিম।

বাবা প্রায়ই জৈয়িতাকে গল্প শোনান। রাতে বাবার পাশে শোবার সময় রাজা-রানি, ভূত-পেতনির কত গল্প! জৈয়িতার শর্ত রাখতে গিয়ে বাবার গল্পের মজুদ শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলেন! জৈয়িতাও বুঝে ফেলে সেটা! মুখের ওপর বলে বসে 'তুমি সত্যি বলছ তো গল্পটা বাবা?' বাবা মুচকি হাসেন! মাথা বুলাতে বুলাতে এক সময় জৈয়িতা ঘুমিয়ে পড়ে।

মা হেনার শখ হয়েছে পাহাড় দেখবেন! বনভূমিতে পা রাখবেন! ব্যাংকের সহকর্মী সেকেন্ড অফিসার নূরুননাহারের কাছে শুনেছেন রাঙামাটি বেড়ানোর আসল মজা হচ্ছে পাহাড়ি বনে হাঁটা!

দুপুরের আহার শেষ হলো সবার। লনের পাশে বাংলোর বারান্দায় দোলানো চেয়ারে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন মহিতুল সাহেব। টিলার ওপরে বেশ খোলামেলা বাংলোটা। পাহাড় দেখা যায়! দূর থেকে মনে হয় পাহাড়টি আকাশছোঁয়া! উঁচু পাহাড়টা দেখছিলেন তিনি! হাতে কয়েকটি ক্যান্ডি। পাশের রিজার্ভ বাজার থেকে এনেছেন জৈয়িতা ও তামিমের জন্য।

শাহিদাকে ডেকে তা দেখিয়ে বললেন 'এগুলো ওদের দাও।'

গাড়িচালক রানাসহ সবাই পাহাড়ের দিকে রওনা হলো! হেনা তামিমকে এবং বাবা জৈয়িতাকে নিয়ে গাড়িতে উঠে বসলেন পিছনের আসনে। সামনের আসনের সারিতে তামিমের বাবা ও মা।

- ওরে বাবা! কত্ত বড়ো পাহাড়! জৈয়িতা চিৎকার করে উঠল! সবার দৃষ্টি গেল পাহাড়ের দিকে। গাড়ি থেকে একে একে সবাই নামল। জৈয়িতা গাড়ি থেকে নেমেই দৌড়! পিছনে তামিম। জৈয়িতার মা ওদের পিছু নিলেন!

- মামনি! ও মামনি, থামো থামো! পইড়া যাইবা! হাঁপাতে হাঁপাতে রানা পাহাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করে! পিছনে ছুটছে বাবাও!

পাহাড়ের দিকে যেতে যেতে মহিতুল সাহেবের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা! রাঙামাটির নামকরণ, বসবাসকারী

উপজাতিদের পূর্ব পুরুষদের আদি নিবাস, কোথায় ছিল ইত্যাদি নানা কাহিনি! হেনা ও শাহিদা মাথা নাড়ায়।

জৈয়িতা ও তামিম পাহাড়ে উঠে গেল। খানিকটা জায়গা সমতল। নানা গাছে পাহাড়ের বনভূমি। হঠাৎ জৈয়িতা দেখতে পেল একটি ডোরাকাটা বিড়াল। তাকে তাড়া করছে তুষার ধবল লোমশ সাদা একটি কুকুর। জৈয়িতার মনে হলো ওরা পরস্পর বন্ধু। দু'জনেই এগিয়ে গেল। গাছের শুকনো ডাল ও আগাছায় ঘেরা সবুজ ভূমি। তার মধ্যে গভীর সুড়ঙ্গ! কুকুরটি কী যেন দেখছে সেখানে দাঁড়িয়ে। ওরা দেখল বিড়ালটি সেই বিশাল গর্তে পড়ে গেছে। অসহায় বিড়াল ওপরে ওঠার প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু সকল প্রয়াসই ব্যর্থ। কী করবে এ সময় তা নিয়ে কুকুরটি এদিক-সেদিকে করছে!

ওরা দু'জন সরে এল সেখান থেকে। একটি জারুল গাছের নিচে এসে বসল ওরা। জৈয়িতা লক্ষ্য করল কুকুরটার মুখে একটা দড়ি। সে তার কিছু অংশ ফেলছে মাটির সেই গহ্বরে। তারপর দড়ির শেষ অংশ কুকুরটা মুখে নিয়ে তিন-চারবার ঘুরে তা বাঁধল একটা গাছের সঙ্গে। এবার কুকুরটা দড়ির মাঝখানটা মুখে নিয়ে টানতে শুরু করল পিছনে ফিরে। দড়ি ধরে বিড়ালটা আস্তে আস্তে বের হয়ে আসে। কুকুর বিড়ালটাকে জড়িয়ে ধরল। বিড়াল কুকুরটার গালে হাত বুলিয়ে দিয়ে সজোরে দিলো দৌড়। আর কুকুরটা তার পিছনে ছুটতে থাকে। তারপর হারিয়ে গেল দু'জন। এ দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যায় জৈয়িতা ও তামিম! তামিম জৈয়িতার দিকে তাকালো কষ্টময় চোখে। বাবার কথা ভাবল জৈয়িতা। 'বন্ধুর সঙ্গে রাগ করে থাকতে নেই। বিপদেই বন্ধুর পরিচয়।' হাত বাড়িয়ে দেয় তামিমের দিকে।

- এসো তামিম আড়ি ভাঙি।

জৈয়িতা বুড়ো আঙুলটি ওর মুষ্টিবদ্ধ একই আঙুলে স্পর্শ করে। ■

অপূর্ব দেশ

মারিশা মাহপারা

দেশটি আমার সোনার দেশ
দেশের মানুষের মন উদার,
শস্যে ভরা ফসলের ক্ষেত
নীল নদীগুলো ঘিরে আছে যার।
রাত্রিবেলায় জোছনার আলো
গগণ ভরা তারার আলো,
মায়ের দেশ! আমার দেশ!
অপূর্ব বাংলাদেশকে বাসি যে ভালো।

চতুর্থ শ্রেণি, দাহাকুলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঘারপাড়া, যশোর

আমার গ্রাম

মো. আবু বকর

গ্রামটি আমার মায়া ভরা
বয়ে গেছে নদী
ছোট্ট বেলার অনেক স্মৃতি
মনে পড়ে নিরবধি।
সন্ধ্যাবেলা বাঁশ বাগানে
জোনাকির আসর বসে
মনটা আমার জুড়িয়ে
যায় এমন দৃশ্য দেখে।
ভোরবেলাতে ঘুম ভেঙে যায়
দোয়েল পাখির শিষে
এমন সুন্দর গ্রাম পাবে না
অন্য কোনো দেশে।

অষ্টম শ্রেণি, ওয়ারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

নিবন্ধ

শুভ্র শরতের কথা

মেজবাউল হক

বন্ধুরা, বর্ষণমুখর দিনের পর বাংলার প্রকৃতিতে আগমন ঘটে শুভ্র শরতের। চোখের সামনে ভেসে ওঠে নীল আকাশ ও সাদা কাশফুলের ছবি। নদীর চরে, বিলের ধারে মাথা উঁচিয়ে থাকা কাশফুল জানিয়ে দিচ্ছে শরৎ এসেছে। আকাশের ভেলায় ভেসে বেড়ানো তুলোর মতো টুকরো টুকরো সাদা মেঘ উঁকি দিচ্ছে পৃথিবীর বুকে। আকাশের মেঘ ও কাশফুল এ দুটোই শরতের মূল আকর্ষণ। এছাড়াও শরতে ফোটে শিউলি-জুঁই, শাপলা-পদ্মসহ কত হরেক রকমের ফুল। চারিদিকে বিরাজ করে শান্ত-স্নিগ্ধ পরিবেশ। দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়...

ভাদ্র ও আশ্বিন মাস মিলে শরৎ বাংলার ষড়ঋতুর তৃতীয় ঋতু। শরৎকে ইংরেজিতে বলা হয় 'Autumn'। উত্তর আমেরিকায় একে ডাকা হয় 'ফল' হিসেবে। পৃথিবীর ৪টি প্রধান ঋতুর একটি হচ্ছে শরৎকাল। উত্তর গোলার্ধে সেপ্টেম্বর মাসে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে মার্চ মাসে গ্রীষ্মকাল ও শীতকালের মধ্যবর্তী ঋতু হিসেবে শরৎ আগমন করে। এ সময় রাত তাড়াতাড়ি আসে এবং আবহাওয়া ঠান্ডা হতে থাকে। প্রকৃতিকে নতুন করে দেখার বেলা যেন শরৎ। বাংলার লোকসংস্কৃতির সঙ্গেও দারুণভাবে জড়িয়ে আছে ষড়ঋতুর এই রানি। বাঙালির দিনযাপনে শরৎ আসে আবেগ নিয়ে।

শরতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শুভ্রতা। সর্বত্রই শুভ্রতার ছড়াছড়ি। হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি এসে সবকিছু ধুয়ে-মুছে দেয় নিমিষেই। তখন শুভ্রতা আরো উজ্জ্বল হয়ে ধরা দেয় মানুষের মনে। শরতের বৃষ্টিস্নাত প্রকৃতি দেখে হৃদয়ে

বেজে ওঠে নতুন গান। শরৎ যেন প্রতিটি সাধারণ মানুষের মধ্যে কবি ভাবকে জাগ্রত করে দেয়।

বাঙালির সামনে শরতের সৌন্দর্য উপস্থাপন করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শরৎ নিয়ে তিনি লিখেছেন প্রচুর কবিতা-গান। এর মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন। বিভিন্নভাবে শরৎকে নিয়ে নিজের আবেগকে তুলে ধরেছেন কবিগুরু। তিনি তাঁর গান, কবিতা দিয়ে সবাইকে শরৎকাল উপভোগ করতে শিখিয়েছেন। তাঁর গানগুলো শুনলেই শরতের সকল সৌন্দর্য ধরা পড়ে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রিয় শরৎকে স্বাগত জানিয়ে লিখেছেন,

'আমরা বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ, আমরা গেঁথেছি শেফালিমালা/নবীন ধানের মঞ্জরী দিয়ে সাজিয়ে এনেছি ডালা/এসো গো শারদলক্ষ্মী, তোমার শুভ্র মেঘের রথে/এসো নির্মল নীলপথে...'

তিনি আরো বলেছেন, 'শরৎ তোমার অরুণ আলোর অঞ্জলি/ছড়িয়ে গেল ছাপিয়ে মোহন অঙ্গুলি/শরৎ তোমার শিশির- ধোওয়া কুন্তলে-/বনের পথে লুটিয়ে পড়া অঞ্চলে/আজ প্রভাতের হৃদয় ওঠে চঞ্চলি।' শরতের আকাশে শিমুল তুলার মতো শুভ্র মেঘেদের দলবেধে ছুটে বেড়ানো দেখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, 'অমল ধবল পালে লেগেছে মন্দ মধুর হাওয়া'।

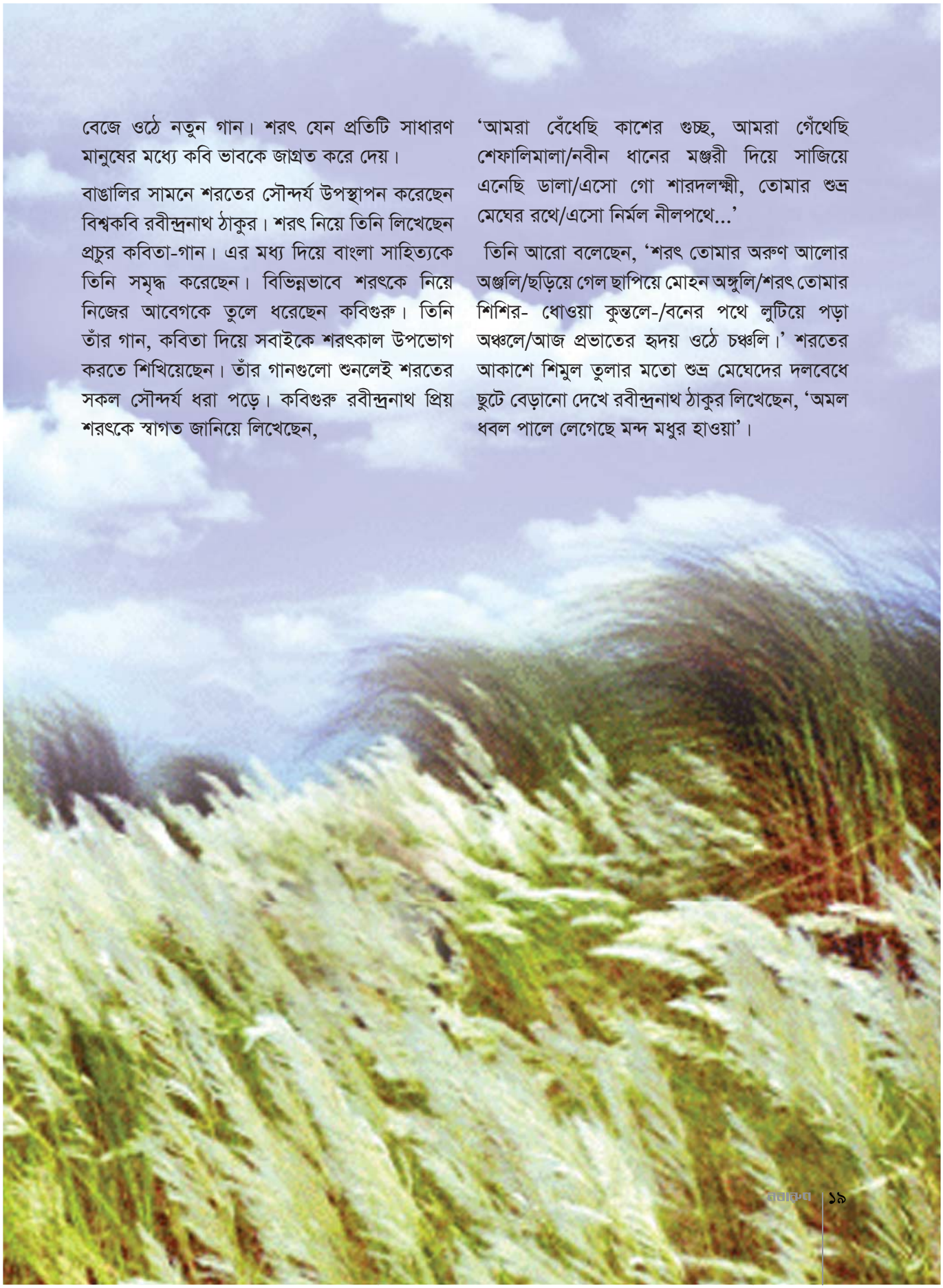

শরৎ শুধু প্রকৃতিতেই পরিবর্তন আনে না, বদলে দেয় মানুষের মনও। সেই পরিবর্তনের কথা যেমন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যে রয়েছে তেমনি রয়েছে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখায়ও। তিনি লিখেছেন, শিউলি ফুলের মালা দোলে শারদ রাতের বুকে ঐ/এমন রাতে একলা জাগি সাথে জাগার সাথী কই...। শরতের বন্দনা করে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামও লিখেছেন অসংখ্য গান ও কবিতা।

মহাকবি কালিদাস শরৎ বন্দনা করে 'ঋতুসংহার' কবিতায় বলেন- 'কাশফুলের মতো যার পরিধান, প্রফুল্ল পদ্মের মতো যার মুখ, উন্মত্ত হাঁসের ডাকের মতো রমণীয় যার নূপুরের শব্দ, পাকা শালিধানের মতো সুন্দর যার ক্ষীণ দেহলতা, অপরূপ যার আকৃতি সেই নববধূর মতো শরৎকাল আসে।'

জীবনানন্দ দাশকে বলা হয় রূপসী বাংলার কবি, নির্জনতার কবি। বাংলা সাহিত্যের শুদ্ধতম কবিও বলা হয় তাঁকে। তাঁর কবিতায় উজ্জ্বল হয়ে আছে বাংলার প্রকৃতি, যেখানে শরতের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। 'রূপসী বাংলা' কাব্যে তিনি বলেন- 'এখানে আকাশ নীল-নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল/ ফুটে থাকে হিম শাদা-রং তার আশ্বিনের আলোর মতন;/ আকন্দফুলের কালো ভীমরূল এইখানে করে গুঞ্জরণ'।

কবি জসীমউদদীন শরতকে দেখেছেন 'বিরহী নারী' মননে। তিনি লিখেছেন-'গণিতে গণিতে শ্রাবণ কাটিল, আসিল ভাদ্র মাস,/ বিরহী নারীর নয়নের জলে ভিজিল...

শরৎ যেমন বাঙালি সংস্কৃতিতে প্রবলভাবে বিস্তার করে আছে তেমনি সাহিত্যে রয়েছে শরতের শত শত গুণগান। যুগে যুগে কবি-সাহিত্যিকরা ঋতু-প্রকৃতি বন্দনায় মুখর থেকেছেন সর্বদাই। এর মধ্যে শরৎ বাদ যায়নি বরং বেশ গুরুত্বই দিয়েছেন। তাই কবি বন্দনায় বাংলার গ্রামীণ প্রকৃতিতে শরতের রূপের খোঁজ মিলে ভিন্ন ভিন্ন উপস্থাপনায়। শারদ সম্ভার নিয়ে রচিত হয়েছে অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধ।

বিশ্বসাহিত্যেও শরৎকে নিয়ে রয়েছে অসংখ্য কবিতা। কবি ফ্রানারজ তাঁর 'মাই ওটাম গার্ল' কবিতায় লিখেন, 'তোমার শরৎ ঠোঁট/শরৎ চুল/শরৎ চোখ/শরৎ হাসি/ শরৎ গ্রীবা/আমি শরৎকালে স্রষ্টাকে চুম্বন করি।' 'Home' কবিতায় কবি Bruce Weigl লিখেছেন– 'I did not know I was grateful for such late autumn bent up corn yields.'

কানাডার সাহিত্যিকরা শরৎকে মনে করেন খানিকটা বিরতির সময়। তার মানে একটু জিরিয়ে নেওয়া। আমেরিকানরা মনে করেন শরৎ কিছুটা নরম ও আরামদায়ক সময়। চাইনিজরা শরতের তৃতীয় মাসের শেষ রাতে বৃষ্টির শব্দ শুনে ঘুমাতে বেশ পছন্দ করেন। শরৎকে নিয়ে এমন অনুভব তাদের সাহিত্য চেতনাকে সমৃদ্ধ করে।

প্রকৃতির রূপবদলে সবসময়ই ফুলের ভূমিকা অনেকখানি। এই শরতে নানারকম ফুলের দেখা মিলে। বর্ষার ফুল ফোটা অব্যাহত থাকে এই শরতে। শরতের ফুল মূলত তিনটি–কাশ, শিউলি ও পদ্ম। শরতের শেষ দিকে ফোটে ছাতিম ফুল। খালেবিলে-ঝিলে ফোটে চোখ জুড়ানো লাল শাপলা-শালুক। আরো ফোটে কলমি ফুল। পূর্ণিমার রাতে ফুটন্ত শাপলা-শালুক দেখতে খুবই মায়াবি। এই দুর্লভ দৃশ্য শুধু এই শরতে দেখা মেলে। এছাড়া এ সময়ে ফুলের মধ্যে রয়েছে হলুদ রাঙা সোনাইল বা বান্দরলাঠি, বিলিতি জারুল, শ্বেতকাঞ্চন, এলামেন্ডা ইত্যাদি। ফলের মধ্যে রয়েছে আমলকি ও জলপাই।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ঋতুর পরিবর্তন হয়। পরিবর্তন ঘটে ঋতুর বৈচিত্র্যেও। নাগরিক জীবনের শরৎ উদযাপন ও গ্রামীণ জীবনে শরৎ উদ্‌যাপনে ভিন্নতা রয়েছে। সে যাই হোক, শরৎ প্রতি বছর বাঙালির জীবনে আসে নতুন আবেদন ও আবহ নিয়ে। শরতে মুগ্ধ হয়ে কবিরা সাদা সাদা পৃষ্ঠায় অক্ষরের মালা গেঁথে লেখেন কবিতা। আর এভাবেই চলে এসেছে বছরের বছর এবং চলবে আগামীতেও। ■

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ছাদির হুসাইন ছাদি

তোমার প্রতি শ্রদ্ধা আমার
থাকবে চিরকাল,
তুমি আমার দেশের প্রদীপ
শ্রেষ্ঠ মায়াজাল।

দেশ বাঁচানোর যুদ্ধে তুমি
প্রাণ দিয়েছ হেসে,
তোমার স্মৃতি মনের মাঝে
চলছে ভেসে ভেসে।

তুমি মহান করেছো প্রমাণ
তুমি বাংলার প্রাণ,
চারিদিকে ছড়িয়ে আছে
তোমার স্মৃতি-ঘ্রাণ।

ধরণীর বুকে যতদিন রবে
বাংলা বহমান,
সবার মনে থাকবে মিশে
শেখ মুজিবুর রহমান।

জাতির পিতা

মিহির হোসেন

শত কোটি সালাম জানাই
প্রিয় নেতা বঙ্গবন্ধুকে
তাঁর সাহসী নেতত্বে পেয়েছি
মাতৃভূমি প্রিয় বাংলাদেশকে।

তিনি আমাদের জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
সারা দুনিয়ার মানুষ
গায় তাঁর গুনগান।

ষষ্ঠ শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

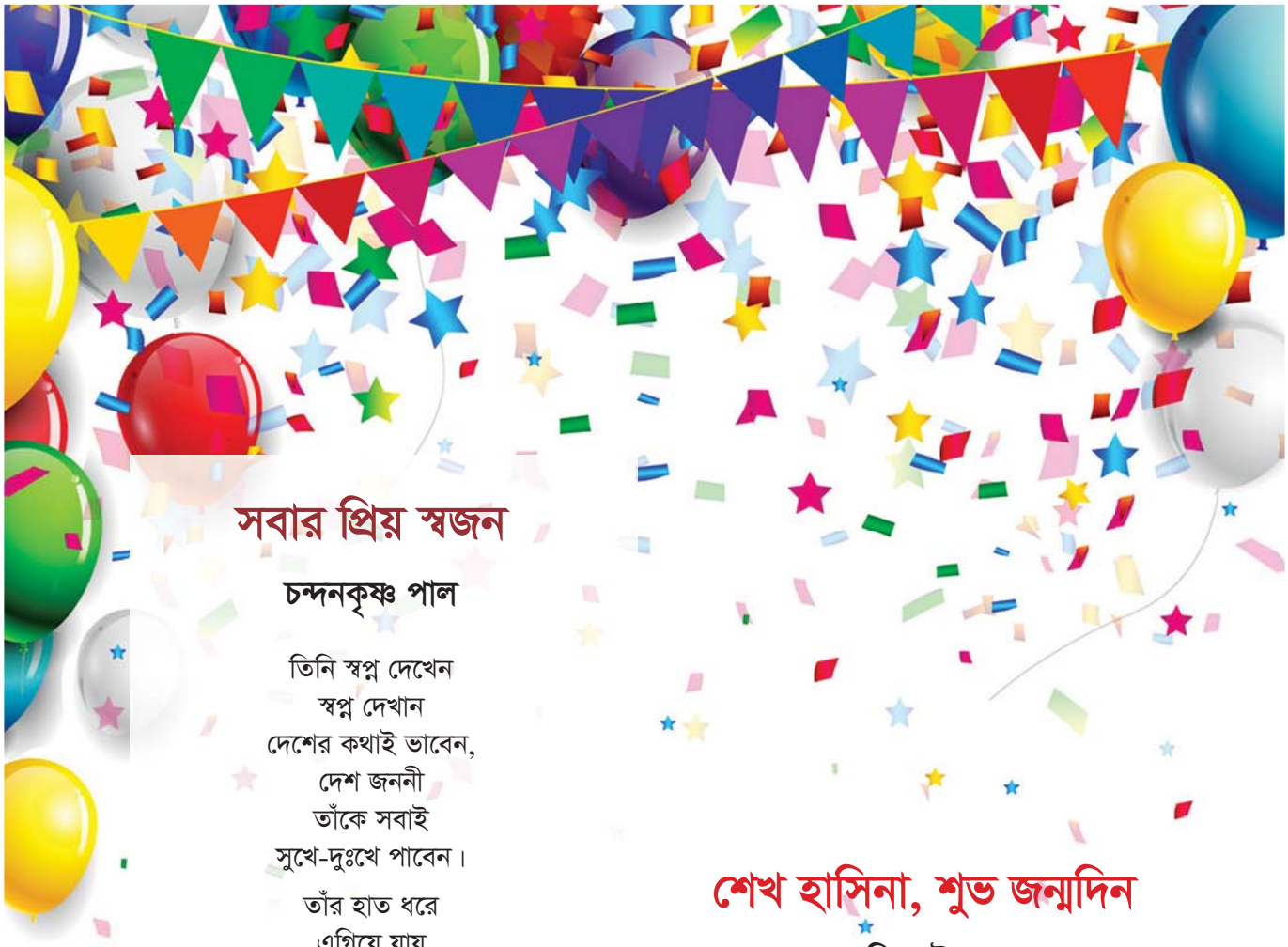

সবার প্রিয় স্বজন

চন্দনকৃষ্ণ পাল

তিনি স্বপ্ন দেখেন
স্বপ্ন দেখান
দেশের কথাই ভাবেন,
দেশ জননী
তাঁকে সবাই
সুখে-দুঃখে পাবেন।

তাঁর হাত ধরে
এগিয়ে যায়
বাংলা নামের দেশ,
নীল আকাশ আর
সবুজ ঘাসে
ভালোবাসার রেশ।

তাঁর আশ্বাসে
সাহস তো পাই
স্বপ্ন দেখি কত,
তিনিই সবার
প্রিয় স্বজন
বোন ও মায়ের মতো।

তিনি প্রিয়
শেখ হাসিনা
এই আকাশের আলো,
দীর্ঘায়ু হোন
তার হাত ধরে
দেশটা চলুক ভালো।

শেখ হাসিনা, শুভ জন্মদিন

নওশিনা ইসলাম

শেখ মুজিবের কন্যা তুমি শেখ হাসিনা নাম
জন্মেছিলে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রাম।
তোমার পিতা করল স্বাধীন গড়ল নতুন দেশ
কিন্তু হঠাৎ দমকা ঝড়ে সব হলো যে শেষ।
তুমি এসে ধরলে হাল, দেখালে নতুন স্বপ্ন
দেশের জন্যে কাজ করে আজ তুমিই দেশরত্ন।
উন্নয়নে জ্বাললে আলো, যা ছিল অন্ধকারে
বদলে যাওয়া বাংলাদেশ আজ বিশ্বের দরবারে।
দেশনেত্রী শেখ হাসিনা ভাবছি তোমায় খুব
তুমিই আমার বাংলাদেশের বদলে যাওয়া রূপ।
হাজার যুগেও শোধ হবে না তোমার কাজের ঋণ
বেঁচে থাকো শেখ হাসিনা, শুভ জন্মদিন।

একাদশ শ্রেণি, দিঘুলীয়া এ. জেড উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, পাবনা

কবিতায় শরৎ

শরতের কাশফুল

গোলাম নবী পান্না

মনে হবে তুলো রাশি রাশি,
উড়ে যায় পাশাপাশি।

সাদা মেঘ আকাশের গায়
ছুঁয়ে যায় নীল সীমানায়।

শরতের সাদা কাশফুল
মন থেকে মুছে দেয় ভুল।

শুভ্রতা এনে দেয় মনে
এই ছবি জন থেকে জনে–

ছাপ রেখে যায় সেই দেখি
কবিদের তাই লেখালেখি।

শরতের দেখা আবার

রাকিবুল হাসান রাকিব

দেখা হবে আবার শরতের সকালে।
সোনালি রোদের আলো শিশিরের কণা ঘাসে।
ঘাস ফড়িং-করবে খেলা সেই আলো দেখে।
শিশুরা খেলবে হেসে হেসে।

দেখা হবে আবার শরতের পড়ন্ত বিকেলে।
নদীর তীরের কাশফুল বাতাসে দোলাবে।
শীতল হাওয়া এসে মন-প্রাণ জুড়াবে।
কেউ এসে কাশফুলে লুকোচুরি খেলবে।

দেখা হবে আবার সূর্যের তার সাথে।
বেলা ডুবিবার আগে সন্ধ্যার ফাঁকে।
গোধূলির আলোমাখা আকাশের ধারে।
কুয়াশার শিশির কণা রাতে নেমে আসবে।

মেঘের ভেলা

নূর হোসাইন গাজী

শান্ত নদীর প্রান্ত ছুয়ে
কাশফুলেরা হাসছে
শরৎ এল শরৎ এল
এই খুশিতে ভাসছে।
ঋতুর রানি আসলো আবার
মেঘের ভেলায় চড়ে
শাপলা-শালুক শিউলি নিয়ে
শুভ্র শাড়ি পরে।
বকুল ফুলে গন্ধ ছড়ায়
প্রাণটা জাগে প্রাণে
দুচোখ জুড়ে ঘুম আসে না
হাসনাহেনার ঘ্রাণে।

সাদা মেঘ ও কাশফুল

মো. শাহরিয়ার হোসেন

নীল আকাশে সাদা মেঘ
উড়ে যখন যায়
মনের আনন্দে চেয়ে থাকি
চোখ এড়ানোর নেই উপায়।

নদীর পাশের কাশফুলও
দেখতে ভারি সুন্দর
ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে
জড়িয়ে ধরে মজা করি দিনভর।

সপ্তম শ্রেণি, মাগুরা উচ্চ বিদ্যালয়, নীলফামারি

গল্প

এক টুকরো মাংস

মনি হায়দার

আরে মুরহাটারে ধর ধর ধর... দাদি চিৎকার করতে করতে রাওয়ার পিছনে ছুটছেন। কিন্তু কয়েক পা গিয়েই দাদি দাঁড়িয়ে হাঁপাতে থাকেন। আর রাওয়া মোরগটা কক কক কক ক করতে করতে উঠোন পার হয়ে পূর্ব দিকের দুই ঘরের মাঝখানে গিয়ে মাটি খুঁটতে শুরু করে। মনে হচ্ছে কিছুই হয়নি।

দাদির চিৎকার আর রাওয়া মোরগের কক কক ক কক কক ক শুনে ঘরের বাইরে আসেন হাফিজউদ্দিন। সঙ্গে ছেলে বিপুল, মেয়ে রনজনা। বিপুল পড়ে সিক্সে। রনজনা থ্রিতে। থাকে ঢাকায়। পরশু রাতে ওরা গ্রামের বাড়ি এসেছে, পিরোজপুরের বোথলা গ্রামে। সকালের নাশতা খেয়ে ঘরের মধ্যে বসে ছোটোবেলার গল্প করছিলেন হাফিজউদ্দিন বৌ আর ছেলে- মেয়ের সঙ্গে।

বুঝলে, ছোটোবেলায় স্কুলে যাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে বের হয়ে অনেকদিন স্কুলেই যেতে পারতাম না।

কেন পারতে না? প্রশ্ন করে বিপুল।

বালিশে হেলান দিয়ে চোখ বোজেন হাফিজ, যেতে যেতে রাস্তার ধারের ডোবায় দেখতাম মাছ কিলবিল কিলবিল করে। মাছ দেখলে আর স্কুলে যাওয়ার কথা মনেই থাকত না। ব্যাস, বই-খাতা রেখে মাছ ধরতে নেমে যেতাম।

চোখ বড়ো বড়ো করে তাকায় রনজনা, দাদা-দাদি তোমাকে বকতো না?

হালকা হাই তোলেন হাফিজ, নাহ। সে সময়ে লেখাপড়ার এত কড়াকড়ি ছিল না।

তাই!

দাদির চিৎকার-চেঁচামেচি আর রাওয়া মোরগের ডানা ঝাপটানো দাপাদাপি শুনে গল্প ছেড়ে উঠোনে সবাই। দাদি খোঁপ থেকে ধরতে যেয়েই, রাওয়া সুযোগ বুঝে দে ছুট।

বাড়ির আরো ছেলেমেয়েরা জড়ো হয়েছে উঠোনে। গতকাল বিকেলে বোথলা বাজার থেকে বিশাল আকারের রাওয়া মোরগটা কিনেছেন দাদা। অনেকদিন পর নাতি-নাতনি, ছেলে, ছেলের বৌ বাড়ি এসেছে। বাড়িতে উৎসব লেগেছে। গাছ থেকে ডাব পাড়া হয়েছে। পুকুর থেকে মাছ ধরার আয়োজন চলছে।

এখন? হাফিজ প্রশ্ন করে মাকে, কীভাবে ধরবেন?

তোর বাবা কই গেছে?

বাবা তো গেছে মুড়ার বাড়ি। কেন মা?

তোর বাবার ফিইরা আওনের আগে রাওয়াটা ধরতে অইবে। নাইলে বাড়ি আইয়া বকাকবি করবে হে– দাদির গলায় বিষণ্নতা।

কিন্তু কে ধরবে?

দাদি, আমরা দৌড়ে গিয়ে মোরগটা ধরি? অনুমতি চায় বিপুল।

দাদি হাসেন, দাদু এই রাওয়ার লগে দৌড়াইয়া পারবা না। আর দৌড়াইতে দৌড়াইতে হাত-পায়ে ব্যথা পাইবা। তোমারা শহরের পোলা, গ্রামের রাওয়ার কেরামতি বুঝবা না।

মুখের কথা শেষ হতে পারে না দাদির, একটা আট নয় বছরের ছেলে, কোমরে শক্ত করে একটা গামছা প্যাঁচানো. শরীরটা বেশ তাগড়া, বলা নেই কওয়া নেই– রাওয়ার পিছনে ছুটতে শুরু করে। রাওয়াও দৌড়াতে শুরু করে। দাদি হায় হায় করে ওঠেন। হাফিজ দাঁড়িয়ে থাকে উঠোনে। বাড়ির অন্যান্য ছেলেমেয়েরাও ছুটছে রাওয়ার পিছনে। সবার সঙ্গে ছোটে বিপুল, বিপুলের পিছনে ছোটে রনজনা।

দাদি উঠোনে দাঁড়িয়ে আছেন। হাফিজ ছেলেমেয়েদের পিছনে আসতে চেষ্টা করছে। চোখে-মুখে বিরক্তি। বিপুল আর রনজনা পড়ে যদি ব্যথা পায়! কিন্তু মিনিট চারেকের মাথায় বিরাট রাওয়াটা হাতের মুঠোয় নিয়ে সেই ছেলেটা হাজির। মোরগটা কড় কড় কড় শব্দ করছে আর ডানা ঝাপটাচ্ছে। রাওয়া মোরগটা ধরে রাখতে ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু ও ছাড়ছে না। মোরগটা এনে দাদির হাতে দেয়, নেন দাদি।

মোরগটা হাতে নিয়ে দাদি ফোকলা দাঁতে হাসেন, আমি জানতাম রে কালু তুইই মুরহাটারে ধরতে পারবি।

কালু দাঁত বের করে হাসে।

ছেলেটা কে মা? জিজ্ঞেস করে হাফিজ।

কালুরে চিনলি না? চিনবি কেমনে? দাদি আপন মনে বলেন, বাড়িই তো আইলি আট-নয় বচ্চর পর। কালু অইলো পুবের বাড়ির আনিচ মিয়ার নাতি।

আনিচ চাচার নাতি মানে জসিমের ছেলে?

দাদি মাথা নাড়ান, হ। জসিমের পোলা। জসিমের খবর তো জানো?

না, সেই কবে জসিম আর আমি একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম। আমি তো মেট্রিক পাস করে ঢাকা চলে গেলাম। জসিম তো আর লেখাপড়াই করল না। ওর কী হয়েছে মা?

দাদি পায়ের নীচে রাওয়া মোরগটাকে রেখে পা দুটোকে চেপে ধরে দড়ি দিয়ে বাঁধলেন শক্ত করে। মোরগের ডানার প্রান্ত এক হাতে ধরে বলেন, কী অইচে সঠিক কইতে পারি না। হুনচি, জসিমরে বাঘে খাইচে।

বলেন কী?

হ, সুন্দরবনে গেছিল গোলপাতা কাটতে। আর আহে নাই। যাওয়ার মাসখানেক পরে লগের লোকেরা আইয়া কইচে, অরে বাঘে নেচে।

আহা..খুব দুঃখজনক– হাফিজ দুঃখ প্রকাশ করে ঘরের ভিতরে চলে যায়। দাদিও যায় পিছনে পিছনে। মেরাগটাকে জবাই করতে হবে। চালের আটা বানানো হচ্ছে ঢেকিতে। রাতে রুটি বানানোর আয়োজন চলছে। বিপুল তাকিয়ে থাকে কালুর দিকে।

তুমি আমার দিকে চাইয়া কী দেহো? হাসে কালু।

মোরগটা তুমি ধরলে কীভাবে?

কালুর চোখে মুখে উচ্ছাস,ক্যামনে আবার? লড়াইয়া ধরছি। দুই ঘরের পিছনে জঙ্গল তো। বেতবোন, কাফুলা গাছ, ছোড ছোড গাবের চারা – আমার লড়ান খাইয়া মুরহাটা ওই জঙ্গলের মইধ্যে হানছে। হাইন্দাই আটকাইয়া গেছে আর যাইতে পারে না। মুই গিয়ে এই ফাঁকে ধইরা হালাইচি।

তোমার শরীরেতো রক্ত!

ও কিছু না। বেত গাছে

মেলা কাটা। দুই-তিনটা হানচে শরীরের মইধ্যে। তুইলা যশোইরা পাতার রস দিচি ডইলা।

তুমি পরশু রাতে আমাদের ব্যাগ এনেছিলে না? রনজনা দাঁড়িয়ে ওদের কথা শুনছিল।

ঘাড় নাড়ে কালু, হ। বোতলা বাজারে বাস থেইকা তোমাগো নামার সময় মুই হেইহানে ছিলাম। দেখলাম তোমাগো অনেক ব্যাগ বোচকা। আমারে দেইখা দাদায় কইলো, কালু একটা ব্যাগ ল।

কথা বলতে বলতে রনজনা, বিপুল আর কালু বারান্দায় বসে। কালুর খালি গা। বিপুল খেয়াল করে কালুর হাত পাগুলোয় শুকিয়ে যাওয়া কাদায় মাখামাখি।

তোমার শরীরে এগুলো কী?

খালের কাদা। খুউব ভোরে ঘুম দিয়া উইঠা মাছ ধরছি তো...।

তুমি মাছ ধরতে পারো? অবাক রনজনা।

হাসে কালু, পারব না ক্যান? তোমারেও শিখাইয়া দিমু ক্যামনে মাছ ধরে খালের পানিতে। মাছ ধরা খুব সোজা–

না, আমার ভয় করবে।

আমি থাকলে কোনো ভয় নাই–দৃঢ়ভাবে জানায় কালু। লও আমার লগে। তোমাগো একটা মজার জিনিস দেহামু– উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে যায় কালু।

কী দেখাবে? প্রশ্ন করে বিপুল।

ঘুঘু পাখির বাসা।

ঘুঘু পাখির বাসা! বিস্ময় বিপুলের কণ্ঠে। ঘুঘু পাখির বাসা দেখা যাবে?

হ, বাসায় দুইডা ডিমও আছে। ছোট্ট, গোল আর সাদা। তয় ধরবা না। দূর দিয়া দেখবা– বলতে বলতে বারান্দা দিয়ে উঠানে নামে কালু। কালুর সঙ্গে রনজনা আর বিপুল।

কেন? ধরলে কী হবে? জানতে চায় রনজনা।

ধরলে আর ডিম ফুইটা বাচ্চা অইবে না। তখন মা ঘুঘু পাখি খুব কষ্ট পায়, দিনে-দুপারে করুণ সুরে গান গায়, বাছা ক্যান তোরা ফুটিস না? ডানা মেইলা উড়িস না...

রনজনা আর বিপুলের ধারণা, ওরা শহরে থাকে। অনেক কিছু জানে। কিন্তু এখন বুঝলো কালু যা জানে, তার বিন্দুও জানে না ওরা।

সারাদিন ঘুঘু পাখির বাসা, পাকা কলার কাঁদি, রাস্তার ধারে ছোটো মাছের আনাগোনা দেখে বাড়ি আসে। দুপুরে খাবার খেয়ে যায় পাশের গ্রামে ছোটো চাচার নতুন বাড়ি। নতুন বাড়ি থেকে দাদার বাড়ি আসে রাতে। রাত একটু বেশিই হয়েছে। আসার পর দাদি দ্রুত খেতে দেয় সকালের রাওয়া মুরগির সালুনের সঙ্গে চালের আটার রুটি। বাবা, দাদা, ছোটো চাচা সবাই রাওয়ার মাংসের ঝোলের সঙ্গে রুটি প্যাঁচিয়ে মুখে দিয়ে চিবোয়।

দাদা চিবুতে চিবুতে বলেন, খুব মজা হইচে।

হ্যাঁ বাবা। অনেক বছর পর মুরগির মাংসের সঙ্গে চালের আটার রুটি খাচ্ছি– বলতে বলতে তাকায় বিপুলের দিকে, কী ব্যাপার বিপুল? তুমি খাচ্ছো না কেন?

আমার খেতে ইচ্ছে করছে না বাবা।

ক্যান খাইতে ইচ্চা করতেছে না দাদা ভাইয়ের? দাদা আদরের সঙ্গে জিজ্ঞেস করেন, ঘুম পাইচে?

না।

তাইলে কী আমার রান্ধন পচা অইচে? দাদি হাসেন।

কালু এত কষ্ট করে সকালে মোরগটা ধরল, ওকে কেন একটু এক টুকরো মাংস দিলে না দাদি? ওকে তো আমাদের সঙ্গে খেতে বলতে পারতে।

বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনের বিশিষ্ট মুখ হাফিজউদ্দিনের মুখে রাওয়া মোরগের মাংসের স্বাদ কেমন তেতো মনে হলো। দাদি মাথা নীচু করে রাওয়া মোরগের মাংসের বাটি নাড়াচাড়া করছেন। দাদা অবাক হয়ে একে একে সবার দিকে তাকাচ্ছেন।

রনজনা ফিসফিসিয়ে বিপুলের কানে বলে, চলো ভাইয়া আমরা কালুকে ডেকে আনি! ■

ভাষা দাদু

শব্দের অর্থ

তারিক মনজুর

আচ্ছা, গরুর নাম যদি গোলাপ হতো; আর গোলাপের নাম হতো গরু! তাহলে ব্যাপারটা কেমন হতো? নাবি বিষয়টা নিয়ে ভাবছিল। আর একা একাই হাসছিল।

বই সামনে নিয়ে ছোটো ভাইকে হাসতে দেখে নেহা ভ্রূ কুঁচকালো। বলল, 'কী, নাবি! পড়তে বসে কী ভাবছিস?'

নাবি বলল, 'আপু, মানুষ যদি গরুর নাম গোলাপ রাখত, আর গোলাপের নাম গরু রাখত, তাহলে কি আমরা গরুকে গোলাপ বলতাম, আর গোলাপকে গরু বলতাম?'

'দূর, বোকা! গরুর নাম গোলাপ হবে কেন? আর গোলাপের নাম কোন দুঃখে গরু হবে?' নেহা বলে। পরক্ষণে নেহার মনে হয়, আচ্ছা, সত্যিই যদি এমন হতো, তাহলে কি শব্দের অর্থ পালটে যেত? সে মোবাইল হাতে নিয়ে ভাষা-দাদুকে ফোন করে।

সন্ধ্যার সময় ভাষা-দাদু বই নিয়ে বসেন। নতুন কিছু জানার চেষ্টা করেন। আজ পড়ছিলেন প্লেটোর লেখা বই। নেহার ফোন পেয়ে বইটা পাশে রাখলেন। বললেন, 'নেহা দাদু নাকি! তোমাদের স্কুল কি খুলেছে?'

নেহা বলল, 'দাদু, স্কুল হয়ত খুলে যাবে। কিন্তু আমি তোমাকে ফোন করেছি একটা বিষয় জানতে।'

কোনো কিছু জানতে চাইলে ভাষা-দাদু সবচেয়ে খুশি হন। তিনি প্রশ্নের অপেক্ষায় হা হা করে হাসতে লাগলেন। নেহা বলল, 'আচ্ছা, দাদু, গরুর নাম যদি গোলাপ হতো, তখন কি আমরা গরুকে গোলাপ বলে ডাকতাম? কিংবা গোলাপের নাম যদি গরু হতো, তখন? তখন কাউকে ফুল উপহার দিয়ে কি বলতাম – এই নাও গরু!'

প্রশ্ন শুনে ভাষা-দাদু হাসি থামিয়ে দিলেন। বললেন, 'কথাটা যত সরল মনে হচ্ছে, এত সরল কিন্তু নয়!' তারপর ফোনটাকে বাম কান থেকে ডান কানে নিয়ে বললেন, 'তবে প্রথমেই ধন্যবাদ দেই, এমন দুর্দান্ত প্রশ্ন তোমার মাথায় এসেছে বলে।'

নেহার ফোনে স্পিকার দেওয়া ছিল। নাবি তাই সব শুনতে পাচ্ছিল। সে চিৎকার করে বলল, 'না ভাষা-দাদু, প্রশ্নটা আমার মাথায় এসেছে!'

পাশ থেকে নাবির কথা শুনে ভাষা-দাদু প্রথমে চমকে উঠলেন। তারপর বললেন, 'তাহলে ধন্যবাদটা নাবিকে দেই। কারণ এটা অনেক বড়ো দার্শনিক প্রশ্ন।' এরপর পাশে রাখা বইয়ের দিকে তাকালেন, 'প্লেটোর নাম হয়ত তোমরা শুনেছ। তিনি ছিলেন গ্রিসের একজন দার্শনিক। প্লেটো বলেন, ভাষার শব্দ হচ্ছে দ্যোতক। আর ওই শব্দ দিয়ে যে-বস্তুকে নির্দেশ করা হয় সেটি দ্যোতিত। যেমন, 'কলম' শব্দটি দ্যোতক। আর কলম বললে যে বস্তুটি বোঝানো হয়, সেটি দ্যোতিত।'

'দাদু, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!' নেহা আর নাবি একসঙ্গে বলে ওঠে।

'মনে করো, একটি শব্দ চেয়ার। চেনো তো! চেয়ার বলার সাথে সাথে একটা ছবি বা ধারণা আমাদের মধ্যে তৈরি হয়। এই চেয়ার শব্দটা হলো দ্যোতক। শব্দ শুনে মনে যে ছবি বা ধারণা তৈরি হয়, সেটি দ্যোতিত। এই দ্যোতক আর দ্যোতিতের সম্পর্ক একেবারেই আরোপিত। অর্থাৎ মানুষ ধারণা করে নিয়েছে মাত্র। যেমন, কলম বললে আমরা লেখার উপকরণ বুঝে থাকি। আবার চেয়ার বললে বসার কোনো আসনকে বুঝি। এই কলম বা চেয়ার – এসব শব্দের কোনো অর্থ নেই। একেকটি শব্দ দিয়ে কোনো কিছুকে বুঝে থাকি মাত্র।'

'দাদু, তুমি বলতে চাচ্ছো, শব্দের কোনো অর্থ নেই?' খুব অবাক হয় নেহা। বলে, 'কিন্তু আমাদের ব্যাকরণ বইয়ে যে লেখা আছে, এক বা একাধিক ধ্বনির অর্থবোধক সম্মিলনে শব্দ তৈরি হয়।'

পাশ থেকে নাবি বলে, 'হ্যাঁ, দাদু শব্দের অর্থ আছে। কিন্তু বর্ণের বা ধ্বনির কোনো অর্থ নেই।'

দাদু বলেন, 'ধ্বনি বা বর্ণের অর্থ নেই, ঠিক আছে। ধ্বনি বা বর্ণ মিলে যখন শব্দ তৈরি হয়, তখনও কোনো অর্থ থাকে না। অর্থ আসোলে আমরা ভেবে নিই মাত্র।'

'মানে!' নাবি ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

দাদু ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলতে থাকেন, 'তোমার গরু-গোলাপের ভাবনা দিয়েই বোঝাই। গোলাপকে আমরা গোলাপ বলি বলেই এর নাম গোলাপ। গোলাপের নামকরণ গরু করা হলে গোলাপকে আমরা গরু বলেই ডাকতাম। এখন গোলাপ উচ্চারণের সাথে সাথে যে ব্যাপারগুলো ঘটে, তখন গরু উচ্চারণের সাথে সাথে সেই ব্যাপারগুলোই ঘটত।'

'তাহলে মানুষ যেভাবে নাম দিয়েছে, আমরা সেভাবেই বুঝে থাকি?' নেহা প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। বস্তুর সাথে নামের বা শব্দের সম্পর্ককে আমাদের মস্তিষ্ক সত্য বলে মেনে নিয়েছে। ফলে একটি শব্দ কানে শোনার সাথে সাথে আমাদের মনে এর একটি ছবি তৈরি হয়। এমনকি কোনোরকম ছবি তৈরি না করেও একে বুঝে নিতে পারি। ভাষার

যোগাযোগের এ এক অদ্ভুত ক্ষমতা। আমাদের মস্তিষ্ক অসংখ্য অর্থহীন শব্দকে অর্থযুক্ত মনে করে।'

'শব্দের তাহলে অর্থ নেই!' নাবি পাশ থেকে বিড়বিড় করে।

নাবির কথা ভাষা-দাদু শুনতে পান না। তিনি বলতে থাকেন,'শিশুকাল থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়। শুরুতে শিশু কিছু শব্দ শেখে। আরেক ভাবে বলা যায়, কোনো বস্তুর সঙ্গে সে পরিচিত হয় নাম দিয়ে। যেমন– টেবিল শব্দটি কানে শোনার সাথে সাথে সে দৃশ্যমান টেবিলের সাথেও পরিচিত হয়। এরপর সে যে-কোনো টেবিলকে টেবিল হিসেবে চিনতে পারে।'

'কিন্তু কিছু জিনিস তো চোখে দেখা যায় না। তখন?' নেহা জানতে চায়।

দাদু বলেন, 'ঠিক বলেছ, কিছু উপাদান চোখে দেখা যায় না; যেমন – অভিমান, বেদনা। দৃশ্যমান, অদৃশ্য সব ধরনের উপাদানকেই মানুষ নাম দিয়েছে। শিশুকাল থেকে একেকটি উপাদানকে আমরা চিহ্নিত করতে শিখতে থাকি। বুঝলে?'

নেহা বলে, 'তাহলে বুঝলাম, ধ্বনি বা বর্ণের অর্থ নেই। আবার শব্দেরও অর্থ নেই। মানুষ শব্দের শুধু একটি অর্থ ধরে নেয়। তাই তো?'

'শব্দের একটি অর্থ বলছ কেন? মানুষের ধারণায় এক শব্দের একাধিক অর্থও থাকতে পারে। যেমন– বাড়ি বলতে ঘর বোঝায়। বাড়ি বলতে আঘাতও বোঝাতে পারে। আবার শব্দের যে অর্থ, তা বাক্যের পর্যায়ে গিয়ে পালটে যেতে পারে। 'তার হাত ভেঙেছে' বললে হাতের যে অর্থ হয়, 'তার হাতে অনেক কাজ' বললে হাতের আর সেই অর্থ থাকে না। বাক্যের পর্যায়ে গিয়ে হাতের আরো অনেক রকম অর্থ তৈরি হতে পারে। শেষ পর্যন্ত বাক্যের পর্যায়ে গিয়ে শব্দের অর্থ স্থির হয়।'

ভাষা-দাদুর ফোনে লো-ব্যাটারি সিগন্যাল দিচ্ছিল। তিনি ফোন কাটার আগে বললেন, 'শব্দের অর্থ নিয়ে তো অনেক কথা বললাম! আরেক দিন না হয় বাক্যের অর্থ নিয়ে বলব।' ■

বৃষ্টি

সাবিত্রী রানী

বৃষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর
বৃষ্টি পড়ে সকাল-দুপুর
বৃষ্টি পড়ে সারাবেলা
ছেলের দল ভাসায় ভেলা
বৃষ্টি পড়ে মাঠেঘাটে
কোলা ব্যাঙ সাঁতার কাটে
বৃষ্টি পড়ে উঠোনেতে
ভিজে খুকু আনন্দেতে
বৃষ্টি পড়ে সবাই খুশি
সবার মুখে সুখের হাসি।

শরৎ

মনিরা বেগম

শরৎ মানে রূপের রানি
নীল আকাশ দিচ্ছে পাড়ি
মেঘ-রোদ্দুর লুকোচুরি
কাশফুলের গড়াগড়ি
পাখপাখালি গাইছে গান
জুড়িয়ে যায় মন-প্রাণ
বইছে বাতাস এলোমেলো
রাতের আকাশ লাগে ভালো।

৭ম শ্রেণি, বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

এক ঝাঁক জোনাকি

আহমাদ স্বাধীন

বিকেলের আলো হারিয়ে যাচ্ছে, রোদ মিলিয়ে গেছে গাছেদের সবুজে। সূর্য ডুবছে দ্রুত। হলুদ রোদের রং বদলে গিয়ে সূর্য হলো কমলা। গাঢ় কমলা রঙের সূর্যের বৃত্ত। মনে হচ্ছে ইয়া বড়ো একটা টিপ পরেছে আকাশ। দূরে ঘন সবুজ বন। আকাশের সাথে বন মিশে একাকার। ঠিক যেন আকাশের অগোছালো চুল। কমলা রঙের টিপের মতো সূর্যটা খুব তড়িঘড়ি করে নামছে নিচের দিকে। অদৃশ্য সিঁড়ি বেয়ে নামছে। এই চোখ সয়ে যাওয়া সূর্যটা বেশ দেমাকি হয়। খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে যায় আড়ালে। অথচ সারা দিনের মধ্যে এই সময়ই সূর্যটি সব থেকে বেশি সুন্দর হয়।

আমার যদি জাদুর ডানা থাকত তবে উড়ে যেতাম সূর্যের কাছে। এই শেষ বিকেলের সূর্যটাকে আরো একটু বেশি সময় থেকে যেতে বলতাম।

কিন্তু তা তো হওয়ার না। যেটুকু সময় থাকে সেটুকু সময়ই আমি দেখি। চোখ ভরে দেখি এই গোধূলির সূর্য। এ সময় আমি কারো কোনো কথা শুনি না। বন্ধুদের সাথে খেলা শেষ না করেই চলে আসি আকাশ দেখতে। গোধূলি রঙের আকাশ।

মা ডাকেন পড়ার জন্য।

বাবা ফেরেন অফিস থেকে।

আমি সব ভুলে যাই। কারণ সারাদিনের সব থেকে সুন্দর সময় এটা।

সকালটাও দারুণ লাগে আমার কাছে।

রাত থেকে সকাল হবার যে সময়টা আছে, সেটা

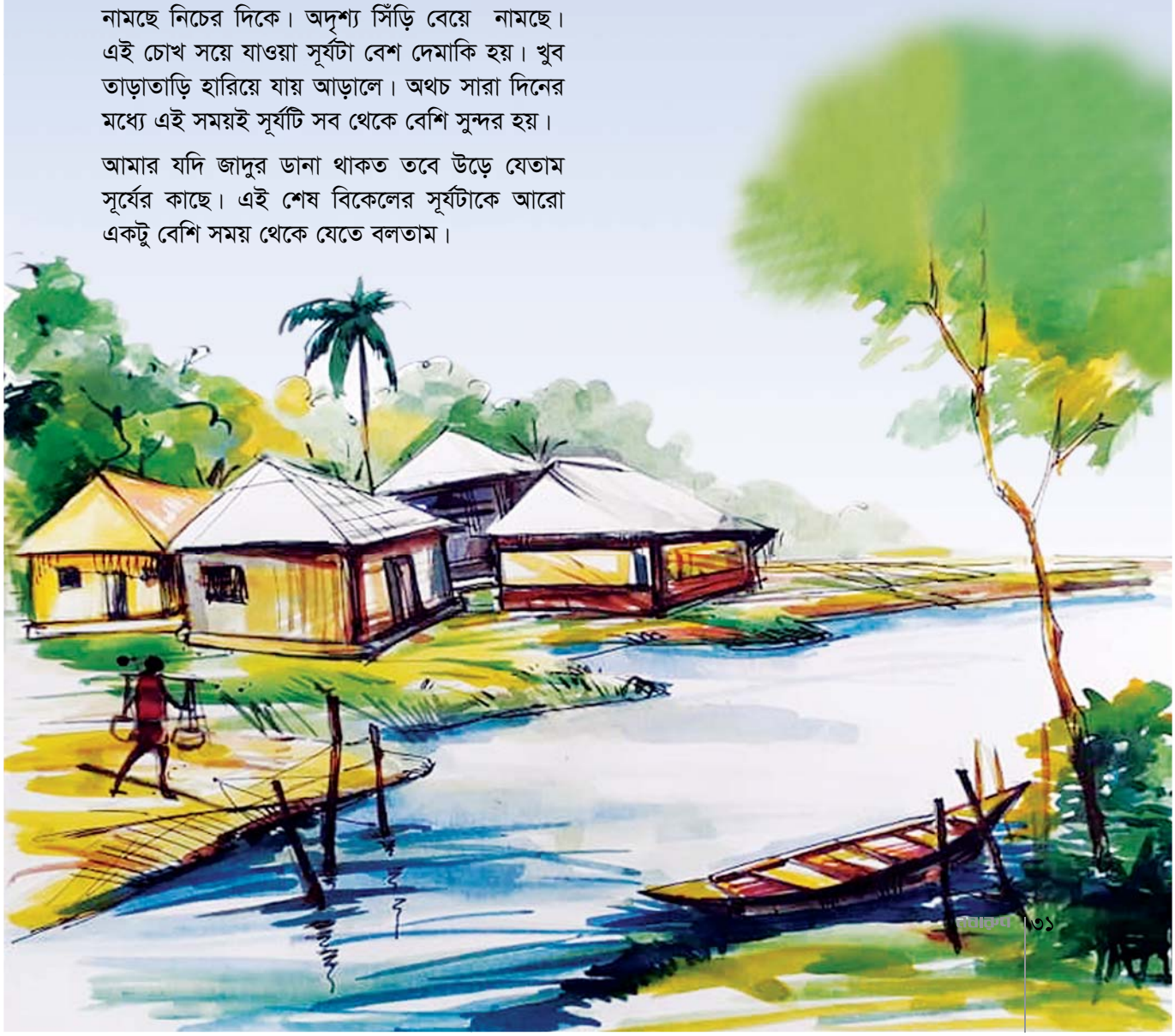

ভীষণ রঙিন স্বপ্নময় একটা সময়। রাতের কালো পর্দা ভেঙে বেড়িয়ে আসে ভোর। সেই ভোরের সূর্যটাও গাঢ় কমলা রঙের হয়। তাপহীন একটা সূর্য। পাখিরা জেগে বেড়িয়ে পরে বাসা থেকে। ফুলগুলো ফুটে যায় সব। বিশুদ্ধ কোমল বাতাস বইতে থাকে। রাত থেকে ভোর হওয়ার এই অপরূপ শৈল্পিক সৌন্দর্য আমি দেখেছি বহুবার। আমাদের বেলকনিতে দাঁড়িয়ে থেকে আমি ভোর দেখি। আর দেখি গোধূলি। প্রতিটা ভোরের একটা গল্প থাকে। প্রতিটা দুপুরের একটা গল্প থাকে। প্রতিটা বিকেলের একটা গল্প থাকে। গল্প থাকে গোধূলি ও রাতেরও। সেই প্রতিটা গল্পের কয়েকটি চরিত্র থাকে। সেখানে থাকে একটা প্রধান চরিত্র। ভোরের গল্প আর গোধূলির গল্পের প্রধান চরিত্র হচ্ছে সূর্য। আকাশ আর মেঘ সেই চরিত্রকে আলোকিত করে। রঙিন করে।

মাঝে মাঝেই ভোরের গল্পের শুরুটা দেখি আমি। তারপর ব্যস্ত হয়ে যাই পড়াশোনায়। আর গোধূলির পুরোটা গল্প দেখা হয় আমার। কারণ গোধূলির গল্পটা ছোট্ট, অথচ ভীষণ রঙিন।

আমি বিনু, শহরে থাকি। ক্লাস সেভেনে পড়ি।

আমি ভালোবাসি আকাশ। আকাশের মেঘ। সবুজ ঘাসের বন। গাছের ঘন সবুজ। আর নদী।

অথচ আমাদের শহরের আকাশ ছেঁয়ে আছে অট্টালিকায়। এখানে মেঘের সাথে আমাদের দূরত্ব অনেক। আর ঘাসের বন তো সব ফুরিয়ে যাচ্ছে। গাছের সবুজও চোখে পরে সামান্যই। তাই স্কুলে লম্বা ছুটি হলেই আমি গাঁয়ে চলে আসি। এখানে আকাশ, মেঘ, নদী, সবুজ সব দেখা যায়। খুব কাছ থেকে দেখা যায়। গোধূলির এই রূপরাশি এ গ্রামে এসেই পুরোটা দেখা যায়।

এখানে আমার পড়াশোনার তাড়া নেই।

মা-বাবার খবরদারি নেই। আছে অনাবিল স্বাধীনতা। ঘাসের বনে নদীর গানে মিশে যাওয়ার স্বাধীনতা।

অনেকগুলো বাঁদুর ছুটোছুটি করছে।

চড়ুই, শালিক, দোয়েলের যখন ঘরে ফেরার তাড়া তখন নিশাচর বাঁদুর নিজেদের ঘর থেকে বের হয়। বেড়িয়ে যায় খাবারের খোঁজে।

আমি দেখতে দেখতে হাঁটতে হাঁটতে ঘাসের বন পেরিয়ে চলে আসি কাশের বনে।

ততক্ষণে গোধূলির গল্প শেষ।

কাশের বনে সাঁঝ নেমেছে। রাতের গল্প শুরু হয়। কাশের বনে অবাক আলোর ঝিলিমিলি।

ছোট্ট ছোট্ট অসংখ্য আলো। কীসের আলো ওগুলো!

আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যাই। দাঁড়িয়ে থাকি অনেকটা সময়। তারপর খুব ধীরে ধীরে কাছে যাই।

আলোগুলো হারায় না। আমাকে ঘিরে উড়তে থাকে।

জোনাকির আলো ওগুলো।

হ্যাঁ, এই অবাক আলোর বাহক হচ্ছে জোনাকি।

আমার একটা কবিতা মনে পড়ল।

জোনাকিরা

কবি আহসান হাবিবের লেখা

ভীষণ রকম ভালো লাগার একটা কবিতা।

এই কবিতার একটা পঙ্‌ক্তি হচ্ছে-

খুশি খুশি মুখটি নিয়ে
তোমরা এলে কারা?
তোমরা কি ভাই নীল আকাশের তারা ?
আলোর পাখি নাম জোনাকি
জাগি রাতের বেলা,
নিজকে জ্বেলে এই আমাদের
ভালোবাসার খেলা...

এই যে রাতের অন্ধকারে কাশের বনে এত্ত আলো, এত্ত উচ্ছ্বাস। এটা ভালোবাসা নয় তো কি?
এই ভালোবাসার আলো আমি এত কাছ থেকে দেখছি এই প্রথম। অথচ জোনাকির ঝাঁক দেখার ইচ্ছেটা আমার অনেকদিনের। 'জোনাকিরা' কবিতাটি পড়ার পর আমি জোনাকিদের নিয়ে কিছু তথ্যও জেনেছি খুব আগ্রহ করে।

জোনাকিরা ল্যামপিরিডি পতঙ্গ পরিবারের একটি

গুবরে পোকা। বাংলায় জোনাকিদের আর একটা মজার নাম হচ্ছে তমোমণি। এরা মূলত পাখাওয়ালা গুবরে পোকা, যাদেরকে সাধারণভাবে জোনাকি পোকা বলে থাকি আমরা।

জোনাকিরা জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে নিজের শরীর থেকে আলো উৎপন্ন করে। এরা এই আলো শিকারের উদ্দেশ্যে অথবা নিজেদের মধ্যে একে অন্যকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশে জ্বেলে থাকে। এরা কোল্ড লাইট বা নীলাভ আলো উৎপন্ন করে কোনো আল্ট্রাভায়োলেট বা ইনফ্রারেড তরঙ্গ ছাড়া। এই আলোর রং হলুদ, সবুজ অথবা কখনো কখনো ফিকে লাল হতে পারে। আলোর তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হলো ৫১০ থেকে ৬৭০ ন্যানোমিটার।

যাই হোক, কবির ভাবনায় জোনাকিরা হচ্ছে আলোর পাখি। আমিও সেটাই ভাবতে চাই।

কারণ এত তুলতুলে নরম আলোর বাহককে পোকা বলাটা অন্যায়।

তাই আমার কাছেও ওরা জোনাকি পাখি।

কাশের বনে আমায় ঘিরে উড়ছে এক ঝাঁক জোনাকি। রাতের গল্পের প্রধান চরিত্রে থাকে মূলত চাঁদ।

তবে আজকের রাতের গল্পের প্রধান চরিত্র এই জোনাকি। কাশের বনের এক ঝাঁক জোনাকি।

জ্বলছে, নিভছে, উড়ছে, খেলছে।

কাছেই এক দল ছোট্ট ছেলে-মেয়ে লুকোচুরি খেলছে। কেউ কেউ দৌড়ে এসে লুকোচ্ছে এই কাশের বনে। আমি কতদিন লুকোচুরি খেলি না। শহরে খেলার তেমন সুযোগ নেই। আমিও খেলব লুকোচুরি। একজনকে ডেকে বলতেই সাথে নিল ওরা আমাকে। আকাশের চাঁদটাও আজ ঝলমলে পূর্ণ আলোয় ঠাসা। আজ রাতের গল্পের প্রধান চরিত্রটা আমি জোনাকিকে দিয়েছি বলে চাঁদ একটুও মন খারাপ করেনি।

বরং খুশিই হয়েছে। আমরা জোছনা রাতের নরম আলোয় লুকোচুরি খেলায় মেতে উঠি।

আমাদের খেলায় চাঁদটাও যোগ দেয়। চাঁদও আমাদের সাথেই দৌড়ায়। লুকায় ধূসর মেঘের আড়ালে।

আর খেলা করে জোনাকিরা।

ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি। কাশের বনে আমরা, জোনাকিরা, চাঁদ আর মেঘ। সবাই মাতি উল্লাসে। এ সময় নিজেকে আমার মানুষ মনে হয় না।

মনে হয় আমিও একটা জোনাকি। কাশের বনের আলোর পাখি জোনাকি। আমার সাথে ছোট্ট ছোট্ট ছেলে-মেয়েগুলোও এক একটা জোনাকি।

আমরা সবাই এক ঝাঁক জোনাকি হয়ে জোছনার আলোয় মিশে যাই। তখন জোনাকির ঝাঁক আরো বড়ো হয়ে ওঠে। কাশের বনে ছুটে বেড়াই আমরা এক ঝাঁক জোনাকি। ■

গল্প

লুকোচুরি

মুহসীন মোসাদ্দেক

মনটা এত খারাপ যে বলে বোঝাতে পারব না! টেবিলে বসে বইটা সামনে মেলে রাখলেও তাতে মন বসানো যাচ্ছে না কিছুতেই! এমন মন খারাপ আমার আগে কখনো হয়েছে বলে মনে পড়ে না।

আনমনা হয়ে পড়েছিলাম। এর মধ্যে বিছানার পাশে জানালার পর্দায় খসখস শব্দ কানে এলে খুব অলসভাবেই তাকালাম সেদিকে। আর তাতে ধপ করে লাফিয়ে উঠলাম আমি! জানালার পর্দার ফাঁক দিয়ে মাথা বের করে আছে মিউ! জানালার

পাশে যেতেই মিউ আমার কোলে লাফিয়ে পড়ল! আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম। সে খুব হালকা স্বরে মিউ করল একবার, আর কোনো শব্দ করল না! অসহায়ের মতো মুখ করে সে তাকিয়ে থাকল আমার দিকে, যেন বলতে চাইছে, 'আমাকে এভাবে দূরে সরিয়ে দিও না! প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ...'

আমি ওকে জাপটে ধরলাম আবার।

মিউ আমার পোষা বিড়াল। সবসময় আমার সঙ্গে থাকে। আমি খুব আদর করি ওকে। আমার এ আদর সে খুব পছন্দ করে। আমরা একে অপরের খুব ভালো সঙ্গী। সে সবসময় আমার সঙ্গে ঘোরে আর মিউ মিউ করে ডাকে। অথচ আম্মুটা যে কী, ওকে দেখতেই পারে না! ও যে খুব ভদ্র-শান্ত তা নয়, কিছু দুষ্টুমিও সে করে, তাই বলে তাকে দেখতে না পারার মতো কিছু নেই! অথচ আম্মু এমন করে না!

আম্মুর সামনে সে যেন উলটাপালটা কিছু না করে মানে আম্মু যা যা অপছন্দ করে, বিশেষ করে খাবারে মুখ দেওয়া—তা যেন না করে বসে এজন্য সবসময় তাকে চোখে চোখে রাখি। আর সেও আমার খুব বাধ্য। আমার অনুমতি ছাড়া সে কোনো কিছুতে মুখ দিবে না কখনো!

দুপুরে খাবার পরে আমি একটু শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিলাম। বইটাতে এতটা মজা পেয়ে গিয়েছিলাম যে মিউ কেন নিজের কথাও তখন আমার খেয়াল ছিল না! আর তখনই রান্নাঘরে ঘটে গেল ঘটনাটা!

আম্মু রান্নাঘরে এক হাঁড়ি দুধ রেখেছিল, যা সবসময়ই রাখে। এ দুধ আমি যেমন খাই, মিউও তেমন ভাগ পায়। আজ কোনো কারণে হাঁড়ির ঢাকনা দিতে ভুলে গিয়েছিল আম্মু। আমাকে বইয়ে মজে থাকতে দেখে মিউ হয়ত সময় কাটানোর জন্য এ ঘর ও ঘর ঘুরে বেড়াতে গিয়ে দেখেছিল দুধের খোলা হাঁড়িটা। তাই হয়ত বসেছিল হাঁড়ির সামনে। আমি নিশ্চিত সে শুধু বসেছিল, ভুলেও মুখ দেয়নি বরং পাহারা দিচ্ছিল যাতে অন্য কেউ এসে দুধে মুখ না দেয় বা তেলাপোকা কিংবা টিকটিকি দুধের আশেপাশে না আসে! পাহারা দেওয়ার ফাঁকে আমার জন্যই হয়ত অপেক্ষা করছিল বসে। আমি বইতে ডুবে আছি দেখে সে আমার কাছে গিয়ে মিউ মিউ করে বায়না করতে চায়নি! বই থেকে মনোযোগ সরলে আমি তাকে পাশে না দেখে খুঁজতে এলে হাঁড়ির সামনে তাকে দেখতে পাবো। তখন সে আমার কাছে বায়না করবে, আমি তার খাবার বাটিতে দুধ ঢেলে দিলে সে চুকচুক করে তা খেয়ে নিবে—এমনটাই নিশ্চয়ই চেয়েছিল সে। কিন্তু হলো উলটো। আমার পরিবর্তে রান্নাঘরে হাজির হলো আম্মু! হাঁড়ির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মিউ মনে হয় আনমনা হয়ে গিয়েছিল। তাই রান্নাঘরে হঠাৎ আম্মুকে দেখে সে থতোমতো খেয়ে যায়। আর এমনিতে আম্মুকে সে খুব ভয় পায়, একা একা সে কখনো আম্মুর আশপাশে থাকে না। এখন তাকে এক হাঁড়ি দুধের সামনে এভাবে বসে থাকতে দেখে ফেলাটা তার জন্য বেশ অস্বস্তিকর, এ কারণে সে লাফ দিয়ে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাওয়াটা উপযুক্ত মনে করে। কিন্তু আচমকা লাফ দিতে গিয়ে বেখেয়ালে তার পেছনের পায়ে ধাক্কা লেগে দুধের হাঁড়ি মেঝেতে পড়ে তৈরি করল এক ভয়ংকর আওয়াজ! তার সাথে পুরো রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়ল দুধগুলো!

সে বেশ কিছুক্ষণ বাইরে পালিয়েছিল। বিকেলে ফিরে এলে আম্মু কায়দা করে তাকে ধরে ফেলে! তারপর একটা বস্তায় ভরে দারোয়ানকে দিয়ে দূরে ফেলে দিয়ে আসে!

আমি এত অনুরোধ করলাম, পায়ে ধরলাম, কাঁদতে কাঁদতে গড়াগড়ি দিলাম—তবু আম্মুর মন গলানো গেল না! এরপরেই আমার মন খারাপ হয়ে গেল! মিউ না হয় একটা ভুল করে ফেলেছে, তাই বলে তাকে এত বড়ো শাস্তি দিতে হবে! এভাবে ফেলে দিয়ে আসতে হবে!

আমি তো ভেবেছিলাম মিউকে আর কখনো পাব না! এখন সে কোথায় থাকবে, কী খাবে, একা একা কী থেকে কী করবে—সেই ছোটো থেকে সে এখানে আমার সাথে থাকে, রাস্তাঘাটে কিংবা বনজঙ্গলে তার থাকার অভ্যাস তো নেই—চিন্তায় আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল! সন্ধ্যার পর টেবিলে বসে তাই কিছুতেই পড়ায় মন দিতে পারছিলাম না!

এখন স্বস্তি পাচ্ছি। মিউ আমার কোলে বসে আছে—ভাবতেই স্বপ্ন স্বপ্ন লাগছে!

কোলে বসে সে একটু পরপরই তার সামনের একটা পায়ে জিহ্বা বুলাচ্ছে আর আমার দিকে অসহায়ের মতো তাকাচ্ছে! নিশ্চয়ই আচমকা লাফিয়ে জানালা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় কিংবা দারোয়ান ফেলে আসার সময় পায়ে আঘাত পেয়েছে! আমি সেখানে আলতো করে হাত বুলিয়ে মালিশ করতে লাগলাম আর সে চোখ বুজে নিল, সম্ভবত তার আরাম লাগছে এখন।

মিউ খুব শান্ত হয়ে গেছে। একদম মিউ মিউ করছে না, কোনো শব্দই করছে না! নিশ্চয়ই আম্মুর ভয়ে! আম্মু টের পেয়ে গেলে আবার যদি ফেলে দিয়ে আসে—এ ভয়ে হয়ত সে চুপ হয়ে আছে!

মিউকে জাপটে ধরে একটা চুমু দিতে যাবো আর তখনই আমার নাম ধরে ডাক দেয় আম্মু! আমি আর মিউ চমকে লাফিয়ে উঠি। মিউ একটু বেশিই চমকে ওঠে! আর মুহূর্তেই চলে যায় খাটের নিচে!

আম্মু এসে ঘরের দরজা থেকেই আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল! সন্ধ্যায় পড়তে বসার আগে আম্মুর সাথে যখন শেষ দেখা হয়েছিল তখন আমি খুব মন খারাপ করা চেহারা নিয়ে বসেছিলাম। আমি এ মুহূর্তে নিজের চেহারা দেখতে না পেলেও বুঝতে পারলাম আমার চেহারায় এখন কোনো মন খারাপ করা ভাব নেই! কিছুটা স্বস্তি এবং কিছুটা আতঙ্ক মিশিয়ে সন্দেহজনক একটা ভাবই ফুটে আছে সেখানে!

আম্মু ভ্রূ কুঁচকে গম্ভীর স্বরে বলল, 'কী হচ্ছে, রিয়া?'

আমি ঢোক গিলে মিনমিন করে বললাম, 'কী হবে! কিছু না তো!' তারপর সুড়সুড় করে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসে জোরে জোরে পড়তে শুরু করলাম, 'মনে করো, যেন বিদেশ ঘুরে, মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দূরে...'

আম্মু ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে চলে যাওয়ার সময় দরজার কাছ থেকে বলল, 'ওইটাকে যদি আর দেখেছি কখনো, এবার আর ছেড়ে দিয়ে আসব না...'

পড়া থেমে গেল আমার। বুকটা ধক করে উঠল! আম্মু কি মিউকে দেখে ফেলেছে বা মিউয়ের উপস্থিতি টের পেয়ে গেছে!

মনটা আবার খারাপ হয়ে গেল! মিউয়ের মতো এমন কিউট একটা বিড়ালের ওপর কেউ কীভাবে এত রাগ করতে পারে! একটু না হয় দুষ্টুমি করে ফেলে মাঝেমধ্যে, তাই বলে এত রাগ হতে হবে! বস্তাবন্দি করে ফেলে দিয়ে আসতে হবে! এই অবলা-নিরীহ একটা বিড়ালের প্রতি এতটুকু মায়া কী থাকতে পারে না কারো মনে! এই এতটুকু ছিল সে, আমি ওকে বড়ো করলাম, আমার কাছে ছাড়া সে কি থাকতে পারবে! কীভাবে পারবে! কখনো পারবে না!

এই যে মায়ার কথা বলছি, এই যে মন খারাপের কথা বলছি—এ কথা কি কেউ বুঝবে! বোঝার মতো কেউ কি আছে কোথাও! কাকে বোঝাবো আমি!

আম্মু চলে গেলেও বেশ কিছুক্ষণ মিউ খাটের নিচেই থাকল। তারপর খুব ধীর পায়ে এদিক-ওদিক চোখ বুলিয়ে সে বেরিয়ে এসে আমার কোলে বসে গেল! আমি আমার জামা দিয়ে তাকে ঢেকে দিলাম।

আমি আর মিউ ঠিক করে ফেললাম, আমরা আলাদা হতে পারব না। আমাদের একসাথেই থাকতে হবে, এভাবেই!

আম্মুর সাথে আমাদের লুকোচুরি শুরু হলো তখন থেকে। মিউকে কিছু বোঝাতে হলো না, সে নিজেই বুঝে গেল লুকোচুরির ব্যাপারটা! আম্মুর আওয়াজ পেলেই সে খাটের নিচে লুকিয়ে যায়। শুধু আম্মুর না, যে-কোনো আওয়াজ পেলেই সে নিজেকে আড়াল করে ফেলে। এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে না। মিউ মিউ করে হইচই করে না। আমার কোলে বসে থাকে, ফিসফিস করে ওকে গল্প বলি। লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার খেতে দিই। আর ঘুমানোর সময় চাদর দিয়ে আড়াল করে রাখি।

বেশ চলতে লাগল আম্মুর সাথে আমাদের লুকোচুরি-জীবন! ■

চারাগাছ বড়ো হয়

সনজিত দে

শিহাব মা-বাবার আদরের ছেলে। এই আষাঢ়ে আট বছরে পা দেবে। সকালে ঘুম থেকে উঠে ছুটে যায় বাগানে। গাছ দিন দিন তার কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। গাছের সাথে প্রতিদিন তার যেন কথা হয়। বাগানকে সে পরিষ্কার রাখে। আগাছা সব ছিঁড়ে ফেলে। ঘুম থেকে উঠে বাগান পরিচর্যা করা তার নিত্যদিনের রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাগান পরিচর্যা করার পর মাকে বলে নাশতা দাও। খিদে লেগেছে। আর পারি না! আগাছা লতাপাতাগুলো তরতর করে বেড়ে যায়। আগাছা থাকলে গাছ কি বাড়ে ? না, এতে গাছগুলোর বল কমে যায়। তার জন্যেই তো প্রতিদিন সকালে বাগান বাড়িতে ছুটতে হয় আমাকে।

শিহাব আমার লক্ষ্মী ছেলে। আমিও ছোটোকালে বাগানে ছোটাছুটি করতাম। কিন্তু তোমার মতো পরিচর্যা করতাম না। আসলে জানতাম না গাছের পরিচর্যা করলে কী হয়। যেমন তুমি অনেক কিছু জানো। তোমার বাগান পরিচর্যা দেখলে মনে হয় হায়রে আমি কত বোকা ছিলাম।

জানো মা ঐ যে জঙ্গল দেখছ, ওখান থেকে একটি ছোট্ট চারা এনে খালি জায়গাটাতে রোপণ করেছি। দেখে নিও আমার মতো ছোট্ট চারাটিও একদিন অনেক বড়ো হবে। ছায়া দেবে, ফল দেবে। ভাবতে ভালোই লাগে। জানো, ওটা রোপণ করতে আমি একটুও সার ব্যবহার করিনি। কুড়িয়ে গোবর এনেছি, গর্ত করেছি, গোবরগুলো গর্তে ঢেলে চারাটা সোজা করে বসিয়ে মাটিগুলো ঝুরঝুরে করে হাত দিয়ে চেপে দিলাম, ব্যাস, গাছ রোপণ হয়ে গেল। তারপর সকাল-বিকালে গাছের গোড়ায় পানি ঢালি। জানো আমার যত্নে গাছটি একদিনে কী সুন্দর লকলকিয়ে বেড়ে উঠছে মা?

শিহাব বাবা, তুই এত সব কার কাছে থেকে শিখেছিস?

কেন টিভি দেখে শিখেছি। টিভিতে কৃষির ওপর কত কিছু দেখায়।

তাই তো বলি, আমার ছেলে টিভিতে নাটক দেখে না অন্যকিছু দেখে তা কোনোদিন খেয়ালও করিনি।

শোনো মা বাড়িতে উঠোন ছাড়া কোনো জায়গা খালি রাখবে না। আমি তো আছি। এই ধরো ঢেড়স, শিমের কয়েকটা বিচি রোপণ করতে পারি আমরা, এতে তরকারির কিছুটা হলেও জোগান দেবে। বারো মাস এখন বেগুন ধরে। বাবাকে বলে বাজার থেকে বেশি না বিশ-পঞ্চাশটা বেগুনের চারা কিনে আনলে দেখবে তোমার আর বেগুন কিনতে হবে না।

শিহাবের কথাগুলো তার মায়ের মনে ধরেছে। এরই মধ্যে বরবটি, ঢেড়স, শিমের বিচি ও বেগুনের চারা কিনে এনেছে বাজার থেকে। এনে আর বসে থাকেনি। মা-ছেলে খালি জায়গায় সেগুলো রোপণ করল। বাড়িতে আর পরিত্যক্ত জায়গাও নেই। আগাছা পরিষ্কার করাতে বাড়ির চতুর্দিক খোলামেলা সুন্দর লাগছে!

মাস দুয়েক পরে শিম গাছে ফুল এসেছে, বেগুন গাছে বেগুন, ঢেড়স গাছে ঢেড়স। বাহ্ আর কী চাই। শিহাব বলল মা আজ ঢেড়স ও বেগুন ভাজি করবে আর মসুরের ডাল রান্না করবে।

ঠিক আছে, বাবা।

মা জানো আজ আমার এত খুশি লাগছে যা কখনো লাগেনি। আমার এবং তোমার লাগানো গাছের তরকারি দিয়ে ভাত খাব।

আমারও খুশি লাগছে শিহাব। আমিও জীবনে প্রথম গাছ লাগালাম এবং আজ নিজেদের বাগানের তরকারি তুলে আনলাম রান্না করব বলে।

আজ নিজেকে সার্থক গৃহিণী মনে হলো।

এভাবে শিহাব, শিহাবের মা বিভিন্ন সিজনে তরকারি চাষ করে। আলু ছাড়া আর কোনো তরকারি তাদের কিনতে হয় না।

শিহাব ইশকুলে যায়, আস্তে আস্তে সেই চারা গাছটি বড়ো হচ্ছে। দেখতে দেখতে তা অনেক বড়ো হয়ে গেল। তাকে আর চারাগাছ বলাটা ঠিক হবে না। এখন অনেক ডালাপালা তার। শিহাব যখন গাছটা লাগিয়েছিল, তখন সে জানত না এটা কী গাছ। অনেক পরে জেনেছে এটা লিচু গাছ। তখন গাছটায় দশ/বিশটা লিচু ধরেছে। এখন থোকায় থোকায় লিচু ধরে। লিচুগুলোও সুস্বাদু। নিজেরা খায়, প্রতিবেশীদের দেওয়ার পর কেউ কিনতে এলে বিক্রি করে কিছু টাকা আয় হয়।

শিহাব এবার জেএসসি দেবে। অথচ একদিন তুমুল ঝড়ে লিচু গাছের একটি ডাল ভেঙে গেছে বলে তার সে কী কান্না। গাছ তুমি ব্যথা পেয়েছ? তোমার ব্যথায় আমিও কেঁদেছি। তুমি দুঃখ করো না। বাবা বলে, জীবন মানেই সংগ্রাম। সংগ্রাম মানে জীবন। গাছ তোমাকে কিছু আগাছা জঙ্গল থেকে এনেছি কেন জানো? এই আগাছার ভেতর তুমি থাকলে জঙ্গল সাফ করার সময় তুমিও কাটা পড়তে। তখন হয়ত তুমি কী জানতাম না। আমার জানার ইচ্ছেও ছিল না। তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছিল তাই তোমাকে এনে রোপণ করেছি। পরিচর্যা করেছি। আজ তুমি তার চেয়ে অনেক বেশি উপকার দিয়ে যাচ্ছ। তোমার কাছ থেকে আলো-বাতাস ছায়া, ফল সব পাচ্ছি। তুমি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমি তোমার পাশে সব সময় থাকব। সেদিনের চারাগাছ আজ তুমি মহিরুহ। তুমি আমার ভালো বন্ধু। প্রিয় বন্ধু। ■

মিথির লাল চিরুনি

সানজিদা আকতার আইরিন

প্রথম জন্মদিনে পাওয়া লম্বা ঠ্যাংওয়ালা গোলাপি পুতুলটি পাঁচ বছরের ছোট্ট মিথির খুবই প্রিয়। নাওয়া, খাওয়া, ঘুম বাদে প্রায় সারাবেলা কাটে পুতুলটিকে সঙ্গে করে। ছোট্ট মিথি বড়ো হচ্ছে পরম যত্নে আর ভালোবাসায়। পরিবারের একমাত্র শিশু বলে তার আহ্লাদের শেষ নেই। তার সকল বায়না মেটায় কেউ না কেউ। দাদির কাছে গল্প শুনে শুনে তার অবসর কাটে। রাজা-রানি, রাক্ষস-খোক্ষস, লাল পরি, নীল পরি আরো কত কী। এত গল্পের মধ্যে মিথির মনে দাগ কাটে লাল চিরুনির গল্পটি। এই গল্পের রাজা-রানি যুদ্ধের পর শত্রুর হাতে বন্দি হয়। রাজকন্যা পালিয়ে যায় জঙ্গলে। সব হারানো মেয়েটির কান্না দেখে বনের সাধুর মায়া হলো। সাধু তাকে উপহার দিলেন একটি সাদা পুঁটলি। যার ভেতরে ছিল একটি লাল চিরুনি আর একটি ময়ূরের পালক। সাধু বলেছিলেন রোজ গোসল করে ইবাদত সেরে তিন বার পুঁটলিতে ফুঁ দিতে। তাহলে ষোলো বছর বয়সে রাজকন্যা তার বাবা-মা ও রাজ্য ফিরে পাবে। আর ফিরে পাবে সুন্দর একটা রাজপ্রাসাদ। লাল চিরুনিটিই হয়ে যাবে রাজপ্রাসাদ। চিরুনির প্রতিটি দাঁত হয়ে যাবে এক

একটি দারুণ কক্ষ। আর ময়ূরের পালকটির প্রতিটি অংশ হয়ে যাবে এক একটি ধন- রত্নের ভাণ্ডার। গল্পের শেষে অমনটাই ঘটে। অবুঝ মিথি গল্প শুনে শুনে এসব বিশ্বাস করে নেয়। সেই থেকে তার বায়না একটা ময়ূরের পালক। বায়নাটি পূরণ করতে ছোটো মামার বেশি দিন লাগেনি। আর লাল চিরুনি আসে বাবার কাছ থেকে। পরম যত্নে পালক আর চিরুনিটিকে সাদা কাপড়ে পুঁটলি করে রাখে মিথি। মা আর দাদির মতো রুকু-সিজদা নকল করে রোজ পুঁটলিতে ফুঁ দেয় সে। মিথির এই কাণ্ড বেশিদিন গোপন থাকে না। চোখে পড়ে যায় সকলের। প্রথমে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে সবাই। কিন্তু মিথি তার বিশ্বাসে অটুট। বার বার বুঝিয়েও ফল না পেয়ে এক সময় হাল ছেড়ে দেয় সবাই। ভেবে নেয় বড়ো হলে ঠিক বুঝবে।

দিন যায়, মাস যায়। মনে মনে মিথি তার স্বপ্নের মহল সাজাতে থাকে। আঁকার খাতার পাতায় পাতায় আঁকতে থাকে রাজপ্রাসাদের নানা ছবি। আর বার বার হিসাব করে আর কত দিন পর তার ষোলো বছর হবে। দিন মাসের হিসাব বড়ো কঠিন। হিসাব মেলে না কিছুতেই। তবুও সে হাল ছাড়ে না। হিসাব কষেই চলে। এ যেন এক কঠিন তপস্যা। তার বিশ্বাস ঠিক একদিন সে রাজকুমারী হয়ে রাজপ্রাসাদের মালিক হবে। তার থাকবে অনেক মনি-মানিক্য।

কিছুদিন পর মিথির স্কুলের এক বন্ধুর বাড়িতে আগুন লেগে সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। শিক্ষকগণ সবাইকে বলেন ওর পাশে থাকতে। বলেন, সাহায্য নয় - বন্ধুকে উপহার দাও। পাঁচ বছরের মিথি এত কিছু বুঝে না। পরদিন সবাই যখন টাকাপয়সা, খাবার এনে জমা দিলো, মিথি নিয়ে এল তার প্রিয় বস্তু খেলার সাথি লম্বা ঠ্যাং- ওয়ালা পুতুলটি। শিক্ষক বুঝিয়ে দিলেন বন্ধুর এসব নয়, দরকার টাকাপয়সা, থাকার জায়গা। মুহূর্তেই মিথি বুঝে গেল তার করণীয় কী? বাড়ি ফিরে মিথি সাদা পুঁটলিটি বুকের মাঝে জড়িয়ে ধরে। পারে যদি কলিজায় লুকিয়ে রাখে। মা-কে বলে, 'মা দান করা কি ভালো কাজ' ? 'মা বলেন, হ্যাঁ মা। খুব ভালো কাজ'। মিথি পুটলিটি আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরে রাখে।

পরদিন মিথি খুব ভোরে গম্ভীর মুখে পরিপাটি হয়ে, নাশতা সেরে স্কুলের জন্যে তৈরি হয়। ক্লাস শুরু হলে মিথি শিক্ষকের হাতে গুজে দেয় তার স্বপ্নের রাজপ্রাসাদ , সাদা পুঁটলিটি। শিক্ষক পুঁটলি খুলে অবাক হয়ে তাকান মিথির দিকে। এগুলো কী? কেন এনেছ মিথি? কী হবে এসব দিয়ে? ছোট্ট মিথি ভেজা কণ্ঠে জবাব দেয়, আমার রাজপ্রাসাদটি ওকে দিয়ে দিন। তাহলে কদিন পরেই ওর থাকার মতো বাড়ি হবে। অনেক ধন-রত্নও পাবে। ওদের কষ্ট থাকবে না। কথার মাথামুণ্ডু খুঁজে না পেয়ে ছুটির পরে মিথির মায়ের ডাক পড়ে অফিস কক্ষে। শিক্ষক জানতে চান মিথির মানসিক সমস্যা আছে কি না। সে কেন একটা সাদা পুঁটলি দান করতে চায়। কেনইবা তাকে রাজপ্রাসাদ আর মনি-মানিক্য বলছে। মিথির মা আনন্দে বিমোহিত হন। মিথি এত বড়ো দানবীর? সে তার স্বপ্নটাই দান করে দিল। আমার মেয়ে সত্যিই মহান। আমি গর্বিত। মা মেয়ের এলোমেলো কথার আগামাথা উপস্থিত কেউ কিছুই বুঝলেন না। তারপর আস্তে আস্তে মিথির মায়ের কথায় সবাই আবিষ্কার করলেন মিথির মনের বিশালতা।

পাঁচ বছরের ছোট্ট মেয়ে কত বড়ো মন থাকলে তার স্বপ্নের মনি–মানিক্য দান করে দিতে পারে। বিদ্যালয়ে এখন তার এই দানের গল্প সকলের মুখে মুখে। তার সর্বস্ব দানে মুগ্ধ হয়ে প্রধান শিক্ষক তাকে উপহার দেন একটি বই ও একটি সুন্দর কলম। আজকাল মিথির বন্ধুর সংখ্যা বেড়ে গেছে বহুগুণ। মিথির এই ত্যাগের মানসিকতায় মিথির মামা তাকে এনে দিলেন একটি সুন্দর লাল রঙের জামা। তার এই সৎ কর্মের জন্য স্কুল ম্যাগাজিনে মিথিকে নিয়ে যে ফিচারটি ছাপানো হয়েছিল তার শিরোনাম ছিল 'শ্রেষ্ঠ দান'। ■

করোনা থেকে সেরে ওঠার পর করণীয়

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

দেশে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ার পাশাপাশি বাড়ছে সুস্থ হয়ে ওঠা রোগীর সংখ্যাও। করোনা উপসর্গ অনেকের ক্ষেত্রে হালকা, অনেকের গুরুতর। তবে শারীরিকভাবে সেরে ওঠার পরও নানা ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। পুরোপুরি স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতেও বেশ খানিকটা সময় লেগে যায়। তাই করোনা থেকে সেরে ওঠার পরও খেয়াল রাখতে হবে কিছু বিষয়। এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের রয়েছে নানা পরামর্শ।

অবসাদ বা ক্লান্তি থেকে যায় অনেকদিন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করা বা সামান্য পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠা স্বাভাবিক। অনেকের করোনা থেকে সেরে উঠার পরও কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত কাশি থাকতে পারে। আবার অনেকে দীর্ঘদিন শুয়ে থাকার কারণে দেহের পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে। হাঁটা-চলায় ও দৈনন্দিন কাজকর্মে সমস্যা দেখা দেয়। খাবারে অরুচি থেকে যায় অনেক দিন। খাবার চিবাতে, গিলতে অসুবিধা হয়। কারো কণ্ঠস্বর ফ্যাসফ্যাসে হয়ে যায়। কথা বলতে অসুবিধা হয়। করোনা সংক্রমণের পর অনেকের মানসিক বিপর্যস্ততা, মনোযোগ ও চিন্তাশক্তির সমস্যা স্মৃতি হারানো, বিষণ্নতার সমস্যাও হতে পারে। ওজন কমে যেতে পারে।

এসব সমস্যার মাঝে আমাদের কিছু বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

প্রথমত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুবার পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয়ে নাও করোনামুক্ত হয়েছ কিনা। হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়া বা যারা বাসায় চিকিৎসা নিয়েছ তাদের ক্ষেত্রে ফলাফল নেগেটিভ আসার পরও পরবর্তী ১৪ দিন বাড়িতে আইসোলেশনে বা পরিবারের অন্যদের থেকে দূরত্ব মেনে চলতে বলা হয়। পরিবারের অন্যদেরকেও মেনে চলতে হবে স্বাস্থ্যবিধি। তবে ১৪ দিন পর সামাজিক মেলামেশার আর কোনো বাধা থাকে না।

ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটি দিক নির্দেশনা দিয়েছে। যেমন–

অনেকের শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়ে। আবার অবসাদও চলে আসতে পারে। কোনো কাজ করতে গেলে হাঁপিয়ে উঠা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে বিশ্রাম নিতে হবে বেশ কিছুদিন। নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার খেতে হবে। সম্ভব হলে একজন পুষ্টিবিদের পরামর্শে সঠিক ও সুষম খাবার গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রচুর পানি ও তরল খাবার খেতে হবে। যাদের খাবার গিলতে সমস্যা হয় তারা বার বার অল্প অল্প করে খাবার খাওয়ার চেষ্টা করতে হবে। তরল খাবার দিয়ে শুরু করা যেতে পারে। খাওয়ার পর আধা ঘণ্টা সোজা হয়ে বসে থাকতে হবে।

করোনা সংক্রমণ পরবর্তী ফুসফুসে জটিলতা দেখা দিতে পারে। কারো অল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট হতে পারে। এক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন ফুসফুসের ব্যায়াম করতে হবে। সেলফ প্রোনিং বা উপুর হয়ে শুয়ে থাকার ব্যায়াম করতে হবে। এতে শ্বাস-প্রশ্বাসের সমস্যা ধীরে ধীরে কেটে যাবে। শারীরিক অবস্থা অনুযায়ী নিয়মিত ব্যায়ামও করা যেতে পারে। এছাড়া হাসপাতালে দীর্ঘদিন শুয়ে থাকার ফলে অনেকের পেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ফিজিও থেরাপি গ্রহণ করতে হবে।

যাদের কণ্ঠস্বরে বা কথা বলতে সমস্যা হয় তারা জোরে বা ফিসফিস করে কথা বলার চেষ্টা না করে কথা কম বলাই ভালো। এক্ষেত্রে বার বার পানি পান করতে হবে।

করোনা থেকে সেরে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই সব কাজ করা যাবে এমনটি আশা করা যাবে না। এসময় এমন কোনো কাজ করা যাবে না যাতে বেশি ঝুঁকে বা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বা উঁচু থেকে কিছু পাড়তে হয়। নিজের দৈনন্দিন কাজ দিয়ে শুরু করতে হবে। ধীরে ধীরে কাজের পরিধি বাড়াতে হবে। কাজের মধ্যে বিরতি নিতে হবে।

রাতে কমপক্ষে ৭/৮ ঘণ্টা ঘুমাতে হবে। দিনেও বিশ্রাম নিতে হবে। গান শোনা, বই পড়া বা মনকে প্রফুল্ল করে এমন কিছু করতে হবে। ■

করোনা

তুর্ন রহমান

করোনায় রাখব মোরা
সাহস আর মানসিক বল
এরই সাথে খেতে হবে
শাকসবজি আর দেশীয় ফল।

বাইরের খাবার থেকে
থাকতে হবে দূরে
যাবে না সকল বন্ধুরা
এ কথাটি ভুলে।

সপ্তম শ্রেণি, সানফ্লাওয়ার স্কুল, টঙ্গি, গাজীপুর

করোনা ভাইরাস

লাবিবা তাবাসসুম রাইসা

ভাইরাস করোনা
আমাকে ধরো না
সচেতন থাকলে
আমার হবে না।

বিদেশ থেকে ফিরে
১৪দিন ঘরে
না হলে করোনা ধরে।

ধুতে হবে হাত
সারাদিন রাত
প্রয়োজন বিনা
বাইরে যাওয়া মানা।
মাস্ক পড়তে হবে
করোনা দমবে তবে।

ষষ্ঠ শ্রেণি, বিএএফ শাহীন স্কুল, ঢাকা

যে অঞ্চলে কখনো বৃষ্টি হয় না

ওয়ার্দা বিনতে আমীর

পৃথিবী হচ্ছে বিচিত্র এক আজব রাজ্য। এ রাজ্যের কোথাও সবুজের সমরোহে ভরপুর। কোথাও ধূসর মরু প্রান্তর, কোথাও রুক্ষ-কঠিন, কোথাও আবার সমুদ্র জলরাশি হিমবাহে পূর্ণ। এমনই এক বৈচিত্র্যময় নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীর পশ্চিম মধ্য এশিয়ার ইয়েমেনের একটি গ্রাম। এ গ্রামের আকাশে মেঘ জমে কিন্তু কখনো বৃষ্টি হয় না। রুক্ষ কঠিন পাহাড়ের বুকে গড়ে ওঠা এ গ্রামে দশকের পর দশক বৃষ্টি ছাড়াই জীবন পার করেন গ্রামবাসীরা।

গ্রামটির নাম আল হুতেইব। এটি ইয়েমেনের রাজধানী সানায় অবস্থিত। গ্রামটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৩২০০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। এ গ্রামে খুব বেশি লোকের বসবাস নেই। তবে এটি ইয়েমেনের একটি আকর্ষণীয় পর্যটন স্থল হিসেবে খ্যাত।

এখানে দিনে প্রচুর গরম আর রাতে নেমে আসে হিমশীতল ঠান্ডা। তবে সূর্য উঠার সাথে সাথে আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠে।

পাহাড়ের কোলে পাথর কেটে কেটে বাড়িগুলো যেভাবে তৈরি করা হয়েছে তা উপভোগ করার মতো। প্রাচীন এবং আধুনিকতার মিশ্রণ গ্রামটির সৌন্দর্য যেন আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এখানে আল-বোহরা জাতির লোক বাস করেন। গ্রামটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩২০০ মিটার উঁচুতে হওয়ায় এখানকার আবহাওয়া রুক্ষ। এছাড়া যে উচ্চতায় গ্রামটি অবস্থিত সে উচ্চতায় মেঘ জমে না। মেঘ জমে তার নিচের স্তরে। এ কারণেই এ গ্রামে কখনো বৃষ্টি হয় না। আর এটাই হচ্ছে আল-হুতেইব গ্রামটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

অনার্স ২য় সেমিস্টার, লালমাটিয় মহিলা মহাবিদ্যালয়, ঢাকা

নিবন্ধ

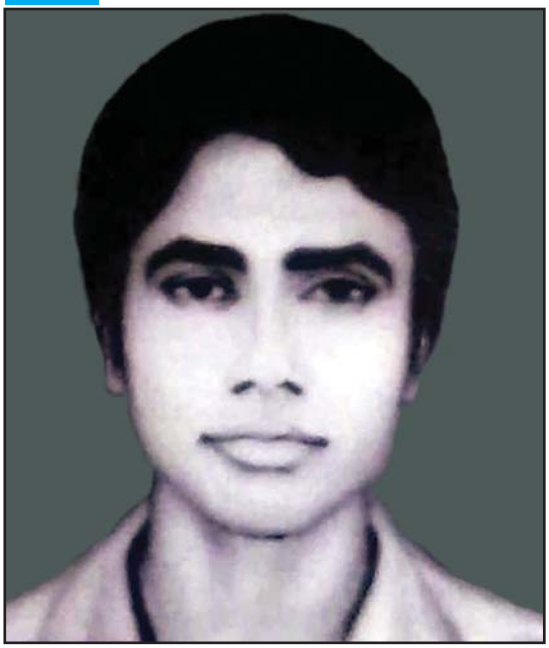

পাবনার কিশোর মুক্তিযোদ্ধা শহিদ বুলগানি

আমিরুল ইসলাম রাঙা

প্রকৃত নাম হাফিজুর রহমান বুলগানিন। তবে সবার কাছে বুলগানি নামেই পরিচিত। মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ১৪ বছরের এক কিশোর মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনা শহরে নকশাল বাহিনী তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাঁর খণ্ডিত মস্তক রাধানগর তৃপ্তি নিলয় হোটেলের সামনে রেখে দিয়েছিল। শহিদ বুলগানি ছিল পাবনার সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা এবং লক্ষ শহিদের মাঝে শীর্ষ পর্যায়ে তাঁর স্থান। পাবনায় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে শহিদ বুলগানি একটি সুপরিচিত নাম।

শহিদ হাফিজুর রহমান বুলগানি ১৯৫৭ সালে রাধা নগরের নারায়ণপুর মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডা. আব্দুর রহমান এবং মাতা মোছা. ছানোয়ারা বেগম। তাঁর পরিবার এলাকায় খুব পরিচিত। তাঁর বাবা ডা. আব্দুর রহমান এলাকায় খুব জনপ্রিয় চিকিৎসক ছিলেন। তাঁদের পরিবার শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত হিসেবে পরিচিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য তাঁর পরিবারের অবদান অপরিসীম। পরিবারের বড়ো ছেলে আতিয়ার রহমান ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক। যুদ্ধের সময় ভারতের নদীয়া জেলার কেচুয়া ডাঙায় মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রানজিট ক্যাম্পে দায়িত্ব পালন করেছেন। তৃতীয় ছেলে শহিদ খলিলুর রহমান কিরন ইস্টবেঙ্গল রাইফেলস এ কর্মরত অবস্থায় ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাতে ঢাকা পিলখানায় নিহত হন। আরেক ছেলে পাবনার শীর্ষ পর্যায়ের মুক্তিযোদ্ধা মিজানুর রহমান তরুণ। মুক্তিযুদ্ধের আগে পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সংগঠক ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের দার্জিলিং জেলার পানিঘাটায় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর ১৯৮৪ সাল থেকে এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায় বসবাস করছেন। তার পরের ছেলে পাবনায় সুপরিচিত বীর মুক্তিযোদ্ধা মমিনুর রহমান বরুণ। সে ভারতের বিহার প্রদেশের চাকুলিয়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা। বর্তমানে পাবনা জেলা সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের সাধারন সম্পাদক। আর ছোটো ছেলে হাফিজুর রহমান বুলগানি ভারতের দার্জিলিং জেলার পানিঘাটায় মুক্তিযুদ্ধের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালে হাফিজুর রহমান বুলগানি রাধানগর মজুমদার একাডেমীতে সপ্তম শ্রেণিতে পড়তেন। এমন অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাবনায় ২৮ এবং ২৯শে মার্চে প্রতিরোধ যুদ্ধে বড়ো দুই ভাই তরুণ এবং বরুণ সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ২৯শে মার্চ পাবনায় অবস্থানরত সমস্ত পাকিস্তানি সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছিল। ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত পাবনা হানাদার মুক্ত থাকে। ১০ই এপ্রিল পাকিস্তানি সৈন্যরা নগরবাড়ী ঘাট হয়ে দ্বিতীয় দফায় পাবনায় প্রবেশ করলে পরিবারের সবাই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁরা ৪ ভাই ভিন্ন ভিন্ন পথে ভারতে চলে যান। ইতিমধ্যে বড়ো ৩ ভাই ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের জন্য কাজ শুরু করেন। বড়ো ভাই আতিয়ার রহমান চুয়াডাঙ্গা মুক্তিযোদ্ধা ক্যাম্পে অবস্থান নেন। মিজানুর রহমান তরুণ প্রশিক্ষণ নিতে দার্জিলিং এর পানিঘাটায় যান। মমিনুর রহমান বরুণ

অন্য পথে যশোর বেনাপোল সীমান্তের রিক্রুট ক্যাম্প থেকে বিহারের চাকুলিয়ায় চলে যান। পরিশেষে হাফিজুর রহমান বুলগানি ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার জলঙ্গি রিক্রুট ক্যাম্প থেকে দার্জিলিং–এর পানিঘাটায় চলে যান। মিজানুর রহমান তরুণ এবং হাফিজুর রহমান বুলগানি দার্জিলিং–এর পানিঘাটায় ট্রেনিং গ্রহণ করলেও কারো সাথে কারো দেখা হয়নি।

১৯৭১ সালে সেপ্টেম্বর অথবা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ। পবিত্র শবেবরাতের আগের রাত। গভীর রাতের কোনো এক সময়ে বুলগানি বাড়িতে এসে হাজির হন। শুধু মাকে দেখেই আবার চলে যাবে। অনেক দিন পর মাকে দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে। মাকে বলে মা, এই রাতটা তোমার কাছে থেকে আগামীকাল রাতেই আমি চলে যাব। তোমাকে দেখব বলে সেই ভাঙ্গুড়া বড়াল ব্রিজ এলাকা থেকে আমি হাঁটতে হাঁটতে তোমার কাছে এসেছি। আগামীকাল শবে বরাতের রাত। আমি আগামীকাল রাতেই ভাঙ্গুড়ায় ফিরে যাব। মাকে সে বলেছে তার কমান্ডারের কাছ থেকে এক রাত থাকার ছুটি নিয়ে এসেছে। কে কমান্ডার কী তাঁর নাম এসব কিছুই বলেনি। শুধু বলেছে আমি ভারতের দার্জিলিং জেলায় প্রশিক্ষণ নিয়ে বর্ডার এলাকায় যুদ্ধ করে কয়েকদিন আগে আমরা চাটমোহর ভাঙ্গুড়া এলাকায় এসেছি। মাকে অনেক কথা বলতে চেয়েছে কিন্তু মা নিজেই এসব কথা শুনতে চান নাই।

শবেবরাতের দিনে দুপুরের দিকের কোনো এক সময় ফাঁকা নির্জন এলাকা। বুলগানি কিশোর মনের আকুলতায় নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে নাই। ভেবেছে অনেকদিন পর দেশে আসলাম। রাতেই চলে যেতে হবে। একটু সামনে হেঁটে আসি। তাই পাকিস্তানি সৈন্যদের গতিবিধি লক্ষ করে বাড়ি থেকে কয়েকশত গজ দূরে মক্তব স্কুলের পাশে গিয়েছিল। দূরে কোথাও গেলে বিপদ হতে পারে। এই মনে করেই হয় তো মক্তব এলাকায় গিয়েছিল। সেখানেই ঘটে তাঁর জীবনের শেষ ঘটনা। পাকিস্তানি সৈন্য বা রাজাকার বাহিনী নয় - মুহূর্তের মধ্যে হাফিজুর রহমান বুলগানিকে পাড়ার নকশাল বাহিনীর ছেলেরা ধরে ফেলে। পাড়ার নকশাল ক্যাডার আবু মিয়া এবং হায়দারসহ সেখানে ছিল নূরপুরের রবি, আনোয়ার এবং যুগী পাড়ার চন্দন।

এই প্রসঙ্গে তৎকালীন সময়কার নকশাল বাহিনীর কী ভূমিকা ছিল সেটা একটু আলোকপাত করা দরকার। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাবনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্যতম দোসর ছিল নকশাল বাহিনী। যার প্রধান নেতা ছিলেন টিপু বিশ্বাস। যুদ্ধের সময় আওয়ামী লীগ এবং মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের শত শত মানুষকে হত্যা করেছে এই বাহিনী। মুক্তিযুদ্ধের সময় সানিকদিয়ার, নাজিরপুর, টিকরী, দাপুনিয়া, মাধবপুর এলাকায় অনেকবার মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে সরাসরি যুদ্ধ হয়েছে। সে সকল যুদ্ধে সেলিম, হামিদ, মোহরম, বারেকসহ বহু মুক্তিযোদ্ধা শহিদ হয়েছেন। যুদ্ধের আগে ২২শে ডিসেম্বর নব-নির্বাচিত এমপি এ আহমেদ রফিককে এরা ছুরিকাঘাতে খুন করে। এছাড়া যুদ্ধের নয় মাসে সাধুপাড়ায় কোবাদ মিষ্টিওয়ালা, দাপুনিয়ার তোরাব চেয়ারম্যান, মক্তবের সোলেমান দোকানদার সহ শত শত মানুষকে হত্যা করেছে। নকশাল বাহিনীর প্রধান ক্যাম্প ছিল হেমায়েতপুর ইউনিয়নের সানিকদিয়ার। সেটা পরিচালনা করতেন টিপু বিশ্বাস। আর শহরের রাধানগরে দুইটা প্রধান ক্যাম্প ছিল। একটি নুরু চেয়ারম্যানের বাড়ি এবং আরেকটি রাধানগর যুগী পাড়ায়। এই ক্যাম্প দুটি পরিচালনা করতেন খন্দকার জিয়াউল ইসলাম মাসুদ। তাঁর অন্যতম সহযোগীরা ছিলেন– রাধানগরের হুমু, বাচ্চু, হালিম, চন্দন, নুর পুরের শহিদ, কামরুল, রবি প্রমুখ। এরা মুক্তিযুদ্ধের সময় হিরালাল, শুকুর, জনি, সামছুল, বুলগানিসহ অসংখ্য মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সমর্থকদের হত্যা করেছে। এদের এইসব হত্যাকাণ্ডের ধরনগুলো ছিল খুবই হিংস্র এবং ভয়াবহ। এদের মধ্যে হিরালালকে হত্যা করে তাঁর মাথা বানী সিনেমা হলের সামনে রেখে দিয়েছিল। শিবরামপুরের জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি ও মুক্তিযোদ্ধা আজাদের ভাই জনি এবং তাঁর বন্ধু সামছুলকে হত্যা করে খণ্ডিত মাথা বরশির সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। একইভাবে কিশোর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান বুলগানিকে হত্যা করে তাঁর খণ্ডিত মাথা রাধানগর তৃপ্তি নিলয় হোটেলের সামনে প্রাচীরের উপর রেখে দেওয়া হয়েছিল।

মুক্তিযুদ্ধে পাবনার জনগণের প্রতিরোধ

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে শত শত মানুষকে হত্যা এবং গুম করার অভিযোগ আছে তাদের বিরুদ্ধে।

প্রসঙ্গত বিষয় হচ্ছে বীর মুক্তিযোদ্ধা হাফিজুর রহমান বুলগানিকে হত্যা করা নিয়ে। শবেবরাতের দিন দুপুরবেলা চিহ্নিত ক্যাডাররা মক্তব স্কুলের পাশ থেকে তাঁকে ধরে নিয়ে যুগীপাড়ার নকশাল ক্যাম্পে নিয়ে যায়। পরের দিন সকালবেলা তাঁর খণ্ডিত মাথা রাধানগর তৃপ্তি নিলয় হোটেলের সামনে প্রাচীরের উপর রেখে যায়। পারিবারিক সুত্রে জানা, যায় শহিদ বুলগানি'র দেহ আর পাওয়া যায় নাই। এরপর দিনের কোনো এক সময় বুলগানির মেজো ভাই মতিউর রহমান বাসু সেখান থেকে তাঁর মাথাটি কয়েকজন নিকট আত্মীয়কে সাথে নিয়ে গোপনে বালিয়াহালট গোরস্তানে সমাহিত করেন।

শহিদ হাফিজুর রহমান বুলগানিকে নিয়ে লিখতে গেলে আরো অনেক কথা লেখা যায়। বুলগানিকে হত্যাকারী অনেকে যুদ্ধের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। বুলগানিকে হত্যাকারী নকশাল ক্যাডার আবু মিয়া আটঘরিয়ার সড়াবাড়িয়া গ্রামে মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। নুর পুরের আনোয়ার স্বাধীনতার পর পাবনায় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়। নুর পুরের রবি স্বাধীনতার পর নকশাল শহিদসহ কুষ্টিয়ায় নিহত হয়। স্বাধীনতার পর প্রায় সবাই আটক হয়ে জেলে যায়। পরবর্তীতে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক ভাবে প্রায় সব হত্যাকারী দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। তবে ৫০ বছর আগের সেই কথা এখনো দুনিয়াতে রয়ে গেছে।

শহিদ হাফিজুর রহমান বুলগানি শহিদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে গেজেট ভুক্ত। তাঁর গেজেট নাম্বার ৩৩৫ এবং লাল মুক্তি বার্তা নং-০৩১১০১০০৪৮. পাবনায় শহিদ মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তালিকার অনেক উপরে। স্বাধীনতার পরে ১৯৭৭ সাল থেকে কয়েক বছর এডওয়ার্ড কলেজ মাঠে শহিদ বুলগানি স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বীর মুক্তিযোদ্ধা বুলগানির স্মৃতি রক্ষার্থে অনূর্ধ্ব- ৪ ফুট ১০ ইঞ্চি উচ্চতার কিশোরদের ফুটবল প্রতিযোগিতা ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। শহিদ বুলগানি'র নামে পাবনায় কোনো সড়ক বা কোনো স্থাপনা নামকরণ করা হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকশিত হবে এবং শহিদ বুলগানি'র স্মৃতি হবে অমলিন। ■

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

শাহানা আফরোজ

সমুদ্র আমাদের সকলেরই প্রিয়। একবার সমুদ্রের জলে পা ডোবানোর ইচ্ছে হয়ত সকল ভ্রমণ প্রিয়দের মনেই উঁকি দেয়। কেউ কেউ অসংখ্যবার সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়েও সাধ মেটাতে পারে না, সুযোগ পেলেই চলে যায় তাই সমুদ্রের টানে। আর সেই সমুদ্রের উপরেই যদি পা রেখে হাঁটার সুযোগ হয়ে যায়, কেমন লাগবে বলোতো বন্ধুরা? ধর্মীয় গ্রন্থে পড়েছিলাম বাসুদেব শ্রী কৃষ্ণকে নিয়ে যমুনা নদী পারি দিয়েছিলেন। এখন যদি তোমরা নদীর ওপর নয় বরং হেঁটে সমুদ্রের মাঝে যেতে পারো তাহলে কেমন অনুভূতি হবে বলোতো। জানতে পেরে নিশ্চয়ই মনটা অ্যাডভেন্চার প্রিয় হয়ে উঠেছে তাই না!

এই অনন্য অভিজ্ঞতা পেতে হলে যেতে হবে মনোমুগ্ধকর বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকতে। চট্টগ্রাম শহর থেকে ২৫ কি.মি. উত্তরে একটি ছোট্ট বাজারের নাম বাঁশবাড়িয়া বাজার। এই বাজারের মধ্য দিয়ে সরু পিচ ঢালা পথে মাত্র ১৫ মিনিটে পৌঁছানো যায় বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র উপকূলে। বাজারের একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে- 'বাঁশবাড়িয়া বাজার হতে সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত প্রতিজনে সিএনজি ভাড়া ২০ টাকা'।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অসাধারণ ও বিস্ময়কর অনেক দৃশ্য ছড়িয়ে আছে সারা চট্টগ্রাম জুড়ে। নানা কারণে জায়গাটি তাই বাংলাদেশের ভ্রমণ প্রিয়দের তালিকার শীর্ষে। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকা। তাই উপকূলীয় এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যসমৃদ্ধ সীতাকুণ্ড উপজেলায় রয়েছে নয়নাভিরাম চন্দ্রনাথ পাহাড়, ইকোপার্ক, সবুজ বনাঞ্চল বেষ্টিত আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ, অসাধারণ সব পাহাড়ি লেক, প্রাচীন স্থাপনাসহ আরো অনেক কিছু। তার মধ্যে নতুন যোগ হয়েছে মনোমুগ্ধকর বাঁশবাড়িয়া সমুদ্র সৈকত। অল্প সময়ের মধ্যেই জায়গাটি পরিণত হয়ে উঠেছে জনপ্রিয় একটি ভ্রমণ স্থানে। এই স্থানের বিশেষত্ব এখানকার সমুদ্র উপকূলে আপনি শুধু সমুদ্রকে দেখার কিংবা সমুদ্রের জলে পা ভেজানোর সুযোগই পাবেন না, সাথে সুযোগ পাবেন সমুদ্রের উপর দিয়ে প্রায় আধা কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখার।

বাশঁবাড়িয়া সমুদ্রের উপর আছে একটি ব্রিজ। এই ব্রিজের উপর দিয়ে হাঁটা যায় সমুদ্রের অনেকখানি পর্যন্ত। ব্রিজটি প্রায় ঢেকে আছে সমুদ্রের জলে। জোয়ারে সমুদ্রের নিচে তলিয়ে যায়, ভাটায় আবার ভেসে ওঠে। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ে ব্রিজের উপর। যার উপর দাঁড়ালে ঢেউ আছড়ে পড়বে পায়ের উপরই। বিকেলের শেষে যখন সূর্যাস্ত দেখবে সে দৃশ্যটিও হবে অসাধারণ একটি অভিজ্ঞতা। সমুদ্রের মতো বিশাল বিশাল ঢেউ ও শীতল করা পরিবেশ চারপাশে। এখানে সমুদ্রের ছোঁয়াই পাবে সর্বত্র।আর মনে হবে সমুদ্রের পাড়ে আছো কিংবা সমুদ্রের উপরই হাঁটছো। এলাকার মুরুব্বীর সাথে কথা বলে জানা যায়, এ ব্রিজটা ব্যক্তিমালিকানাধীন, এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির মালিকানায় নির্মিত, যা একান্তই সন্দ্বীপবাসীদের চলাচলের জন্য। ব্রিজটা প্লাস্টিকের। কারণ সমুদ্রের লবণাক্ত পানি লোহা বা স্টিল তাড়াতাড়ি ক্ষয় করে ফেলে তাই প্লাস্টিক দিয়ে তৈরি। ব্রিজটি মজবুত খুঁটি ছাড়া নির্মিত, যার কারণে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। অহেতুক বড়ো দল নিয়ে ব্রিজে না উঠাই ভালো। যেহেতু কোনো বেষ্টনি নেই, জোয়ার-ভাটার সময়ও মেনে চলা উচিত।

বাঁশবাড়িয়ার এই সমুদ্র সৈকত ক্রমে ঢালু হয়ে নিচু হয়নি। কিছু কিছু জায়গায় ঝপ করে গভীরতা পাওয়া যাবে। এই গভীরতা আর জোয়ারের ঢেউয়ের সময় দক্ষ সাঁতারুকেও বিপদে ফেলতে পারে। বিচটি বড়ো এবং সব দিকে খোলা। চাইলেই যে কেউ যে কোনো দিক দিয়েই ঢুকতে পারে। তাই তোমরা খুব সাবধানে এখানে যাবে আর কাউকে সাথে সবসময় রাখবে।

কেউ চাইলে স্পিড বোটে করে জনপ্রতি ৪০০ টাকা (আপডাউন) দিয়ে সন্দ্বীপ ঘুরে আসতে পারো। ২০ মিনিটের মতো সময় লাগবে।

যদিও সবাই এইটাকে সমুদ্র বলে কিন্তু গুগল ম্যাপে এটাকে খাল হিসেবে দেখায়। তবে সমুদ্রের মতোই বড়ো বড়ো ঢেউ আছে। জায়গাটি দেখে তোমাদের কখনোই খাল বলে মনে হবে না।

চারপাশে ছড়িয়ে আছে সারি সারি ঝাউ গাছ, বিশাল বালুর মাঠ, মনোরম এই পরিবেশ তোমাদের নিয়ে যাবে অন্য এক ভুবনে। কর্মব্যস্ত জীবনে খানিকটা

শান্তির খোঁজে এই ভ্রমণ যাত্রাটি মন্দ হবে না কিন্তু। বিচে ঢুকতেই চোখে পড়বে একচিলতে খেজুর বাগান আর অন্যপাশে বড়ো বড়ো সামুদ্রিক জেলে নৌকা আর নোঙর করা ট্রলার। সকাল বা দুপুরের দিকে গেলে বিচে জোয়ার পাবে আর বিকেলে ভাটা। বিকালে বিশাল বিচে ইচ্ছেমত ঘুরে বেড়াতে পারবে। বিচে ঢোকার পর অনেকটা জায়গা জুড়ে ঘাস আর ছোটো ছোটো জলাশয়। ভাটার সময় সেগুলোতে অল্প বিস্তর পানি থাকে, দূর থেকে দেখলে ছোটো ছোটো দ্বীপের মতো মনে হয়। এই ঘাসে ঢাকা অংশ পার হলেই বিশাল বালুকাবেলা। বিকেলে স্থানীয় ছেলেরা বিচে ফুটবল খেলে, চাইলে তুমিও খেলায় নেমে পড়তে পারো তাদের সাথে।

বিচ ধরে উত্তর দিকে অনেকটা হেঁটে যাওয়ার পর একটি খাল পড়বে। এই খাল ধরে সরাসরি সমুদ্রের পানি আসে। খালটির সৌন্দর্যও চোখে পড়ার মতো। মূলত বিচের দুটি অংশকে পৃথক করেছে এই খাল। খালের ওপারে রয়েছে ম্যানগ্রোভ বনের মতো বিস্তীর্ণ গাছের সারি আর এর সামনে সবুজ ঘাসের উঁচু নিচু জমি। পিকনিক করার জন্য একেবারে উপযুক্ত জায়গা। এইদিকটাতেই উত্তর পাশে অবস্থিত সমুদ্রতীরের ঝাউ বনটি। ঝাউ বনের সাথে মিশে আছে ঢেউয়ের আঘাতে ভেঙে পড়া মাটির খণ্ড। যেগুলো দেখতে অনেকটা ছোটো বড়ো সবুজ পাহাড় মনে হয়।

বিচের অন্যতম আকর্ষণ সূর্যাস্তের দৃশ্য। এক কথায় বলতে গেলে অসাধারণ। শুধুমাত্র সূর্যাস্ত দেখার জন্যই প্রতিদিন এখানে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসে। সারা বিকেল জুড়ে মেঘ আর সূর্যের খেলার পর দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্রের দিকে নানা রঙের বর্ণিল ছটা ছড়িয়ে দিতে দিতে সূর্যের অস্ত যাওয়ার দৃশ্য মনোমুগ্ধকর। এখানে কাটানো প্রতি মুর্হূত সন্ধ্যাটিকে স্মরণীয় করে রাখবে তোমাদের কাছে। সূর্যাস্ত দেখতে হলে তাই দুপুরের পর সেখানে যেতে পারো। তবে শীতের সকালে গেলে সদ্য গাছ থেকে নামানো খেজুর রস খাওয়ার সুযোগ পাবে। সময় সুযোগ হলে ঘুরে এসো একবার বাশঁবাড়িয়া সমুদ্র সৈকতে থেকে।

কক্সবাজারে নতুন সৈকত

উত্তাল সমুদ্রের গর্জন। ঢেউ আছড়ে পড়ার ঝুপঝাপ শব্দ। পাথরের সঙ্গে নোনা পানির ঘর্ষণে সৃষ্ট ফেনা। ভেজা বালুতে সূর্যের আলোর প্রতিবিম্ব ঝলসে দিচ্ছে চোখ। কক্সবাজারের ইনানি সৈকতের পাশেই দেখা দিয়েছে নতুন এই সৈকত।

ইনানি থেকে কিছুটা দক্ষিণে বালু ও পাথরের সামঞ্জস্যে সৃষ্টি হয়েছে অপরূপ এ সৈকতের। কোলাহলমুক্ত এ সৈকতকে স্থানীয়রা ডাকে 'সি পার্ল' নামে। একান্তে কিছুটা সময় কাটাতে এখানে আসতে পারে সৌন্দর্য পিপাসুরা।

সৈকতে নামার আগে টং দোকানের এক কাপ চা মুহূর্তেই ক্লান্তি দূর করে দেয়। ভেজা বালুতে অভ্যর্থনা জানায় শীতল বাতাস। ভাটির সময়ে পানি নেমে যাওয়ায় উঁকি দেয় শত-সহস্র কালো পাথর। পাথরে বসে ছবি তোলা যায় অনায়াসেই। যা স্মৃতি হয়ে থেকে যায় আজীবন। বিকেলে সূর্যের তীর্যক আলো সৈকতের রূপকে করে তোলে আরো মোহনীয়।

কক্সবাজারের ডলফিন মোড় থেকে দক্ষিণে মেরিন ড্রাইভ রোড হয়ে ২১ কিলোমিটার দূরে ইনানি সৈকত। সেখান থেকে একই সড়ক দিয়ে আরো দেড় কিলোমিটার দক্ষিণে গেলেই হোটেল রয়েল টিউলিপ। এ হোটেলের সামনেই 'সি পার্ল' নামে পরিচিত নতুন এ সমুদ্র সৈকত। এখানে আসার জন্য সবসময়ই পাওয়া টমটম, সিএনজি, ছাদ খোলা চাঁদের গাড়ি। চলার পথে হাতের বামে সুউচ্চ পাহাড় আর ডানে সমুদ্র। এমন পরিবেশে গলা দিয়ে আনমনে বেরিয়ে আসবে 'কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা...।' ■

নিবন্ধ

আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

হাসনাত বাবুল

ইউনেস্কো ১৯৬৬ সাল থেকে ৮ই সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস পালন করে আসছে। এ দিবসটি পালনের মাধ্যমে সারা বিশ্বের মানুষকে তারা বলতে চায়, সাক্ষরতা একটি মানবীয় অধিকার এবং সর্বস্তরের শিক্ষার ভিত্তি। প্রতি বছর একটি বিশেষ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সাক্ষরতা দিবস পালন করা হয়।

সাক্ষরতা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবীয় অধিকার হিসেবে বিশ্বে গৃহীত। ব্যক্তিগত ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক ও মানবীয় উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণযোগ্য। এমন কী শিক্ষার বিষয়টি পুরোপুরি নির্ভর করে সাক্ষরতার ওপর। একটি দেশের উন্নয়ন, শান্তি ও সমৃদ্ধি বিকশিতকরণের ক্ষেত্রেও সাক্ষরতা প্রয়োজনীয় হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়। মূল কথা সবার জন্য শিক্ষা– এ স্লোগান বাস্তবায়ন করতে সাক্ষরতাকে ভিত্তি হিসেবে মনে করতে হবে। শুধু অক্ষরজ্ঞান সম্পন্নদের সাক্ষর বলা হয় না, এর সঙ্গে জীবনধারণ, যোগাযোগ দক্ষতা ও ক্ষমতায়নের দক্ষতাও যুক্ত হয়েছে। এক সময় ছিল যখন কেউ নাম লিখতে পারলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। বর্তমানে যিনি নিজ ভাষায় সহজ ও ছোটো বাক্য পড়তে পারবেন, সহজ ও ছোটো বাক্য লিখতে পারবেন এবং দৈনন্দিন জীবনে সাধারণ হিসাবনিকাশ করতে পারবেন তাকে আমরা সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন বলব। ১৯৯৩ সালে ইউনেস্কো সাক্ষরতার সংজ্ঞা পুনঃসংজ্ঞায়িত করে। বাংলাদেশের ভৌগোলিক পরিসরে সাক্ষরতা শব্দের প্রথম উল্লেখ দেখা যায় ১৯০১ সালে লোক গণনার অফিসিয়াল ডকুমেন্টে। শুরুতে স্ব অক্ষরের সঙ্গে অর্থাৎ নিজের নাম লিখতে যে কয়টি বর্ণমালা প্রয়োজন তা জানলেই তাকে সাক্ষর বলা হতো। ১৯৪০-এর দিকে পড়ালেখার দক্ষতাকে সাক্ষরতা বলে অভিহিত করা হতো। ষাটের দশকে পড়া ও লেখার দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে সহজ হিসাব-নিকাশের যোগ্যতাসম্পন্ন মানুষই সাক্ষর মানুষ হিসেবে পরিগণিত হতো। আশির দশকে লেখাপড়া ও হিসাব-নিকাশের পাশাপাশি সচেতনতা ও দৃশ্যমান বস্তুসামগ্রী পড়ার ক্ষমতা সাক্ষরতার দক্ষতা হিসেবে স্বীকৃত হয়। বর্তমানে এ সাক্ষরতার সঙ্গে যোগাযোগের দক্ষতা,

ক্ষমতায়নের দক্ষতা, জীবন নির্বাহী দক্ষতা, প্রতিরক্ষায় দক্ষতা এবং সাংগঠনিক দক্ষতাও সংযোজিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো-এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, দেশে সাক্ষরতার হার ৭৩ দশমিক ৯ শতাংশ এবং ২৬.১% লোক নিরক্ষর। বর্তমান সরকার দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে সাক্ষরতা দানের লক্ষ্যে ৬৪টি জেলায় মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে এবং নিরলস ও অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে সাক্ষরতার হার ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাক্ষরতার হার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। এর বেশিরভাগই সাম্প্রতিক কালের অর্জন। সরকারের কতগুলো ভালো পদক্ষেপ ও কৌশলের কারণে এ সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অল্প সময়ে সাক্ষরতা হারের এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতার পেছনে এ সাফল্য একটি কারণ বলে বিবেচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের শতভাগ সাক্ষরতা অর্জনের প্রচেষ্টায়, জনসংখ্যাকে যথার্থ অর্থেই সম্পদে পরিণত করার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য বা এসডিজির ১৭টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা রয়েছে ৪ নম্বরে। এখানে অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষ ও মানসম্মত শিক্ষক-সংখ্যা বৃদ্ধি,

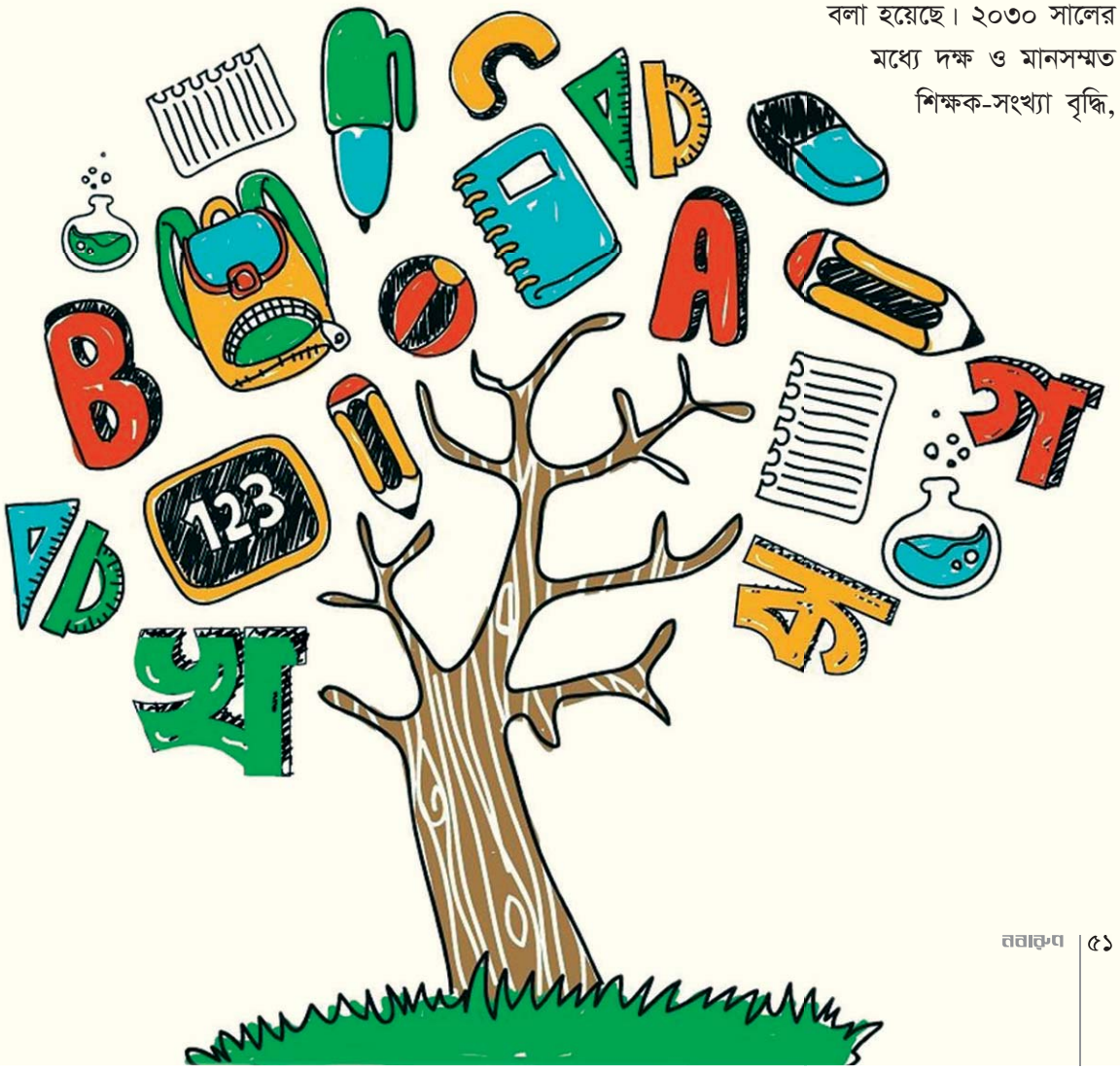

প্রশিক্ষণ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের কথাও বলা হয়েছে। আশার কথা, আমাদের শিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, এনজিও ও সুশীলসমাজ এসডিজির ৪ নম্বর লক্ষ্য নিয়ে নানারকম কাজ করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রাটি অর্জিত হলে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশের পক্ষে উন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কাজটি সহজ হয়ে যাবে বলা যায়। নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে আমরা শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন করতে পারিনি তবে, দেশে যতদিন পর্যন্ত একজন নিরক্ষরও থাকবে, ততদিন পর্যন্ত সাক্ষরতা কার্যক্রম চালিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ বর্তমান সরকার।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথমবার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদযাপিত হয়। স্বাধীনতার পর পরই বঙ্গবন্ধুর সরকার কর্তৃক প্রণীত সংবিধানের ১৭(গ) অনুচ্ছেদে দেশ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৩ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাক্ষরতা দিবসে ঠাঁকুরগাও– এর কচুবাড়ি কৃষ্ণপুর গ্রামকে প্রথম নিরক্ষরমুক্ত গ্রাম হিসেবে ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালে বয়স্কশিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প বাস্তবায়নের ওপর জোড় দেন। ১৯৭৫ সালে সাক্ষরতা সমিতি গঠনের মাধ্যমে গণশিক্ষা চালু করা হয় এবং প্রায় ১৮০০ নিরক্ষরকে সাক্ষর করা হয়।

সাক্ষরতা একটি দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার সঙ্গে সাক্ষরতার আর সাক্ষরতার সঙ্গে উন্নয়নের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে দেশের সাক্ষরতার হার যত বেশি সে দেশ তত উন্নত। সাক্ষর জাতি সচেতন জাতি। শিক্ষা সাধারণত তিনটি উপায়ে অর্জিত হয়- আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক। যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত বা যারা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা পায়নি তাদের সাক্ষরতার জন্য উপানুষ্ঠানিকভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়। তবে বাংলাদেশের সাক্ষরতার হারকে বৃদ্ধি করতে এগিয়ে আসতে হবে সবাইকে। সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় শতভাগ সাক্ষরতা অর্জন ও মানবসম্পদ গড়ে তোলার মাধ্যমে জাতির পিতার কাঙ্ক্ষিত ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতামুক্ত সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে পারব। ■

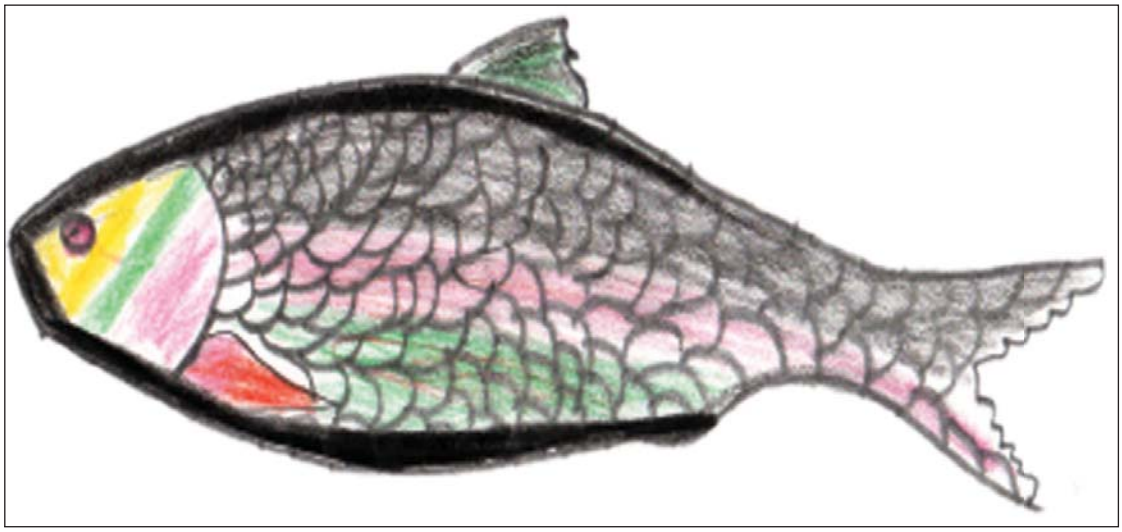

মো. আবদুল্লাহ, শ্রেণি নার্সারি, আলকারীম স্কুল, আশুলিয়া, সাভার

মীনা দিবস

মো. জামাল উদ্দিন

উনিশ'শ উননব্বই সাল থেকে আমাদের দেশে প্রতি বছর ২৪শে সেপ্টেম্বর মীনা দিবস উদ্‌যাপিত হচ্ছে। সরকার, এনজিও ও বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের সহায়তায় ইউনিসেফ প্রতি বছর জাতীয়, বিভাগীয়, জেলা ভিত্তিক ও কমিউনিটি পর্যায়ে মীনা দিবস উদ্‌যাপন করে থাকে।

এ দিবস উপলক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের নিয়ে র‍্যালি, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাঙ্কন, যেমন খুশি তেমন সাজো ইত্যাদি কার্যক্রমের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

মীনা একটি উচ্ছল, প্রাণবন্ত ও সাহসী মেয়ের নাম। মীনা কার্টুন চরিত্রে মীনার বয়স নয় বছর। এই কার্টুন এর আরো দুটি চরিত্রের নাম মীনার ভাই রাজু আর পোষা পাখি মিঠু।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও শিশু নিরাপত্তার গুরুত্ব নিয়ে মীনা কার্টুনের গল্পগুলো তৈরি করা হয়। যৌতুককে না বলা, বাল্য বিয়েকে না বলা, ছেলে ও মেয়ে সন্তানকে সমান গুরুত্ব দেওয়া, সমান অধিকার পেলে মেয়েরাও অনেক কিছু করতে পারে, এইচআইভি আক্রান্ত মানুষকে আলাদা চোখে না দেখা, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করা, বন্যার সময় করণীয় কাজ, মেয়েদের নিরাপত্তার দিকে খেয়াল রাখা, শিশুর ডায়রিয়া হলে করণীয়, করোনা প্রতিরোধে আমাদের করণীয়, শহরে গৃহকর্মীদের ওপর নির্যাতন রোধ ও শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেও এ কার্টুন প্রচারিত হয়।

মীনা কার্টুনের অনেকগুলো পর্ব রয়েছে। এর মধ্যে একটি পর্বের কথা বলা যেতে পারে। সেখানে মীনার বাবা মেয়েকে পড়ালেখা করাতে স্কুলে পাঠাতে রাজি হয় না। ছেলে রাজু স্কুলে যায়। মীনার মন খারাপ হয়। সে তার টিয়া পাখি মিঠুকে স্কুলে পাঠিয়ে দেয়। মিঠুর মাধ্যমে মীনা নামতা শেখে। মীনার শিক্ষা এক সময় কাজে লাগে। পাড়ার মহাজন মীনার বাবাকে ঠকাতে গেলে ব্যাপারটা মীনা ধরে ফেলে। মীনার বাবা বুঝতে পারে মেয়েকেও পড়ালেখার জন্য স্কুলে দেওয়া উচিত। এই একটি কার্টুন পর্বের মাধ্যমে কতশত অভিভাবককে যে সচেতন করা গেছে তার ইয়ত্তা নেই।

গত দুই দশকের ব্যবধানে বাংলাদেশে শিশু শিক্ষার মান অনেক উন্নত হয়েছে। আগের চেয়ে ১০০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। কন্যাশিশু অধিকার সম্পর্কেও আগের চেয়ে অভিভাবকরা অনেক বেশি সচেতন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে মীনা নামের কার্টুন চরিত্রের জন্ম সেটি আজ সফল। 'মীনা দিবস' প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সমাজের শিশুদের সম্পর্ক ও সামাজিক গণসচেতনাতামূলক কার্যক্রমের একটি সার্থক প্রচেষ্টার নাম। ■

নারীর ক্ষমতায়ন: কন্যাশিশুর সাফল্য

অনুপ্রেরণার নাম ছোট্ট থুনবার্গ

জান্নাতে রোজী

পরস্পর যুক্ত হলেই মানুষ বাঁচে–বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছিল একটি সংবাদ মাধ্যমে। সেখানেই তিনি এই হৃদয় ছোঁয়া উক্তিটি করেছিলেন। সাক্ষাৎকারের এই শিরোনামটি পড়ে নিজের মনে নিজেই দগ্ধ হচ্ছিলাম, মনে করার চেষ্টা করছিলাম–করোনা মহামারির এ সময়টাতে আমি কি বাঁচিয়ে রাখার জন্য যুক্ত হয়েছি কারো সঙ্গে বা প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করছি বেঁচে থাকার জন্য? নবারুণের ছোট্ট বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই এ শিরোনামটি দেখেছ এবং আমার বিশ্বাস এর আগেই তোমরা অনেকেই যুক্ত হয়েছ অসহায় মানুষের কল্যাণে। এ সংকটকালে বিপদে রয়েছে যারা তাদের সাহায্যার্থে পরস্পর যুক্ত হলেই যে মানুষ বাঁচে–এ আদর্শে বিশ্বাসী এক ছোট্ট বন্ধুর মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার কাহিনি জানাব আজ আমি তোমাদের। অবশ্য তোমরা অনেকেই তাকে চেনো। হ্যাঁ, বন্ধুরা আমি বলছিলাম ইতোমধ্যে খ্যাতি অর্জন করা জলবায়ু পরিবর্তন বিরোধী আন্দোলনের কর্মী গ্রেটা থুনবার্গের কথা।

১৭ বছর বয়সি এই সুইডিশ কিশোরী বাংলাদেশ ও ভারতের বন্যার্ত মানুষের জন্য ১ লাখ ইউরো অর্থের সহায়তা দিয়েছেন। ২৮শে জুলাই থুনবার্গ তার নিজের টুইটার অ্যাকাউন্টে এ ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশের বেসরকারি সংস্থা ব্র্যাক, ভারতের বেসরকারি সংস্থা গুঞ্জ এবং অ্যাকশন এইড বাংলাদেশ ও অ্যাকশন এইড ইন্ডিয়ার মাধ্যমে এ অর্থ সহায়তা দুর্গতদের কাছে পৌঁছানো হবে। এখন নিশ্চয়ই তোমাদের জানতে ইচ্ছে করছে গ্রেটা থুনবার্গ এত টাকা পেল কোত্থেকে? গ্রেটা গত ২০শে জুলাই গুলবেনকিয়ান প্রাইজ ফর হিউম্যানিটি পুরস্কারে ভূষিত হন। যার অর্থমূল্য ১ মিলিয়ন ইউরো। কিশোরী পরিবেশবাদী কর্মী গ্রেটা থুনবার্গকে এ পুরস্কার দিয়েছে পর্তুগাল।

পরে এ পুরস্কারের পুরো অর্থই পরিবেশের সুরক্ষা ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় কাজ করছে এমন কিছু গোষ্ঠীকে বিশেষ করে গ্লোবাল সাউথে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তায় অনুদান হিসেবে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় থুনবার্গ। এরই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারতের জন্য এই সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া, পুরস্কার থেকে পাওয়া মোট ইউরোর ১ লাখ আমাজানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া রোধে কাজ করা 'ফ্রাইডেস ফর ফিউচার ব্রাজিল'-এর এসওএস আমাজোনিয়া প্রচারণায় দেওয়া হবে। অর্থ সহায়তার ঘোষণা দিয়ে অনলাইনে প্রকাশিত এক ভিডিও বার্তায় গ্রেটা বলেছে, জলবায়ু সমস্যা খুবই জরুরি একটি বিষয়। দক্ষিণ এশিয়ার সাম্প্রতিক বন্যায় লাখ লাখ মানুষ গুরুতরভাবে ভুগছে। কোভিড-১৯ মহামারি ও সাইক্লোন আম্ফানে যখন তারা বিপর্যস্ত, তখনই এর সঙ্গে যোগ হয়েছে এ দুর্ভোগ। আমি সৌভাগ্যবান যে, তাদের সাহায্য করতে নিজের পুরস্কারের অর্থগুলো এই প্রতিষ্ঠানগুলোকে দিতে পারছি।

উল্লেখ্য, পুরস্কার ঘোষণাকারী বিচারকমণ্ডলীর প্রধান জর্জ সাম্পাইও বলেন, পরিবেশ খাতে বিদ্যমান অবস্থা পরিবর্তনে নিজের জোরে লড়াই এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে গ্রেটা তরুণ প্রজন্মকে যেভাবে সংগঠিত করছেন, তার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁকে গুলবেনকিয়ার 'প্রাইজ ফর হিউম্যানিটি' দেওয়া হয়েছে।

থুনবার্গের মতো কোনো পুরস্কার প্রাপ্তির অর্থ হয়ত আমাদের কাছে নেই, কিন্তু আমাদের তো এখন স্কুল বন্ধ, বাইরে বেড়াতে যাওয়া বন্ধ, স্কুলে আসা-যাওয়া বা টিফিনের জন্য যে খরচ হতো বাইরে ঘুরতে গেলে যে খরচ হতো সেটা তো হচ্ছে না। সেখান থেকেই যদি কিছু টাকা (বাবা-মা থেকে চেয়ে নিয়ে) ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াই! সেটাই বা কম কিসের? চলো বন্ধুরা, আজ থেকে আমরা এ কাজে নেমে পড়ি, 'পরস্পর যুক্ত হলেই মানুষ বাঁচে'–এর বাস্তবায়ন করি। আমাদের এ সামান্য সাহায্যই হয়ত কাউকে দেবে অনেক স্বস্তি, শান্তি। ■

শিশুদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র উক্তি

"

শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অপরিসীম মমতা। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, অমিত সাহসী, মানবদরদি এবং পরোপকারী। ছিলেন রাজনীতি ও অধিকার সচেতন।

"

"

সব শিশুর সমঅধিকার নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে বাবা-মা, পরিবার ও সমাজের ভূমিকা অপরিসীম।

"

গল্প

এক পা বাঁধা

মো. মাইদুল ইসলাম জনী

একদিন একটি লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন, পাশেই একটি হাতির আস্তাবল দেখে হঠাৎ থেমে গেলেন, একটি বিষয় মনে দ্বিধা তৈরি করায় তিনি থমকে যান। তিনি দেখলেন এত বড়ো প্রাণীগুলো শুধুমাত্র সামনের পায়ে ছোট্ট একটি দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। কোনো চেইন বা খাঁচা নয়। এই দড়ি এত বড়ো প্রাণীর পক্ষে ছিঁড়ে ফেলা খুবই মামুলি ব্যাপার।

যে-কোনো সময় চাইলে এটি ছিঁড়ে হাতিগুলো মুক্তভাবে চলে যেতে পারে কিন্তু বিশেষ কোনো কারণে তারা তা করে না। ঠিক এই কারণটা তাকে ভাবাচ্ছিল।

কাছেই তিনি একজন প্রশিক্ষককে দেখতে পেলেন এবং কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন কেন এই প্রাণীগুলো এভাবে দাঁড়িয়ে থাকছে, দূরে পালিয়ে যাবার কোন চেষ্টা কেনো করছে না। তখন প্রশিক্ষক উত্তরে বললেন- যখন হাতিগুলো খুব ছোটো ছিল, তখনো তাদেরকে এই একই সাইজের দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হতো। যা বেঁধে রাখার জন্য তাদের ঐ সময়ের সাইজের জন্য যথেষ্ট ছিল। বড়ো হতে হতে হাতিগুলো ধারণা করতে থাকে এই দড়ি তাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, এটি থেকে বেরিয়ে যাওয়া যাবে না। এক সময় এটি বিশ্বাসে পরিণত হয়।

এখন হাতিগুলোর সাইজ দড়ির চেয়ে বহুগুণ বড়ো হলেও তাদের বিশ্বাস যে এই দড়ি এখনো তাদের ধরে রাখতে পারে। তাই তারা তা ছিঁড়ে বাইরে যাবার কোনো প্রচেষ্টা কোনোদিন করে না। লোকটি খুব অবাক হয়েছিল। এই প্রাণীগুলো চাইলেই বন্ধন থেকে বাইরে আসতে পারে কিন্তু শুধুমাত্র 'তারা পারবে না' এই বিশ্বাসের কারণে সেখানেই আটকে থাকে, যেখানে তাদের আটকে রাখা হয়।

হাতির মতো আমাদের অনেকেই বিশ্বাস করে বসে আছেন যে, জীবনে কিছু করতে পারবেন না। শুধুমাত্র জীবনে কোনো এক সময় ব্যর্থ হয়েছিলেন এই কারণে। কিন্তু মানুষ তার মেধা, মননশীলতা ও বুদ্ধি দিয়ে সকল ব্যর্থতা পেছনে ফেলতে পারে- এ বিশ্বাস রাখতে হবে। ■

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঘড়ি

পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো ঘড়ির ওজন ৩৬ হাজার টন! কী বন্ধুরা অবাক হচ্ছো। হ্যাঁ, সত্যিই এত বড়ো ঘড়ি। পৃথিবীর পবিত্র স্থান মক্কা নগরীর কাবা শরীফের পাশে অবস্থিত ১৩০ তলা উঁচু রয়েল ক্লক টাওয়ার। এই টাওয়ারে ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে স্থাপন করা হয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো ঘড়ি। ৩৬ হাজার টন ওজনের ঘড়িটি স্থাপন করতে সময় লাগে আট বছর। সুইস ও জার্মানিসহ বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এটি নির্মিত হয়। ১৪ হাজার গ্লাসের টুকরোর সমন্বয়ে এতে বিভিন্ন রঙের লেখা বসানো হয়েছে। মূল্যবান এই গ্লাসগুলো দিনে ও রাতে আলাদা রং ধারণ করে। ঘড়ির মিনিটের কাটার দৈর্ঘ্য ২৩ মিটার এবং ঘণ্টার কাটার দৈর্ঘ্য ১৭ মিটার। ঘড়ির ওপরে স্বর্ণ দিয়ে নির্মিত আল-হেলাল বা চাঁদের দৈর্ঘ্য ২৫১ মিটার। এর ভেতরের সুবিশাল কক্ষে একসাথে অনেক মানুষ নামাজ পড়তে পারেন। যারা কানে কম শোনেন বা কথা বলতে পারেন না তারা এ ঘড়ি দেখে নামাজের সময় বুঝতে পারেন। তাই দিনে সাদা-কালো ও রাতে সাদা-সবুজ রং ধারণ করে ঘড়িটি। নামাজ পড়ার জন্য ঘড়ির অ্যালার্ম ১০ কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যায়। সৌদি আরবের বাদশা আবদুল্লাহ ইবনে আব্দুল আজিজ-এর আমলে তৈরি হয় এই ঘড়িটি। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এ ঘড়ি ২০১১ সালে উন্মুক্ত করা হয়।

টাইটানিকের চেয়েও ২০ গুণ বড়ো জাহাজ

সিনেমার কারণে আমরা কমবেশি সবাই টাইটানিক জাহাজের নাম জানি তাই না বন্ধুরা। এক সময় টাইটানিক ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো জাহাজ। কিন্তু এখন টাইটানিকের চেয়ে বড়ো জাহাজের অভাব নেই। কিন্তু তাই বলে টাইটানিকের চেয়ে ২০ গুণ বড়ো জাহাজ! বর্তমানে বিশ্বের এই সবচেয়ে বড়ো জাহাজের নাম 'হারমনি অফ দ্য সিজ'। এ জাহাজটি টাইটানিকের চেয়ে ২০ গুণ বড়ো। 'হারমনি অব দ্য সিজ'কে বলা হচ্ছে 'ভাসমান নগরী'। এ যেন সাগরের উপর আরেক পৃথিবী। বিশ্বের সবচেয়ে বড়ো নির্মিত ভারী ও বড়ো জাহাজ এটি। ইংল্যান্ডের সাউদাম্পটন

বন্দর থেকে এ জাহাজের উদ্‌বোধন করা হয়। এটি লম্বায় ১ হাজার ১৮৭ ফুট এবং উচ্চতায় ২৩০ ফুট। জাহাজটি ৬ হাজার ৭৮০ জন যাত্রী বহন করতে পারে। জাহাজটি নির্মাণে ২ হাজার ৫০০ জন শ্রমিক কাজ করেছেন। এই জাহাজ নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৭০০ মিলিয়ন পাউন্ড। এটি ঘণ্টায় ২৫ নটিক্যাল মাইল বেগে ছুটে। আছে ১৮টি ডেক। যার ১৬টি ডেকে আছে ২ হাজার ৭৪৭টি কেবিন। জাহাজটি এত বড়ো যে যাত্রীরা যেন হারিয়ে না যায় সেজন্য তাদের Global Positioning System-GPS ব্যবহার করতে হয়।

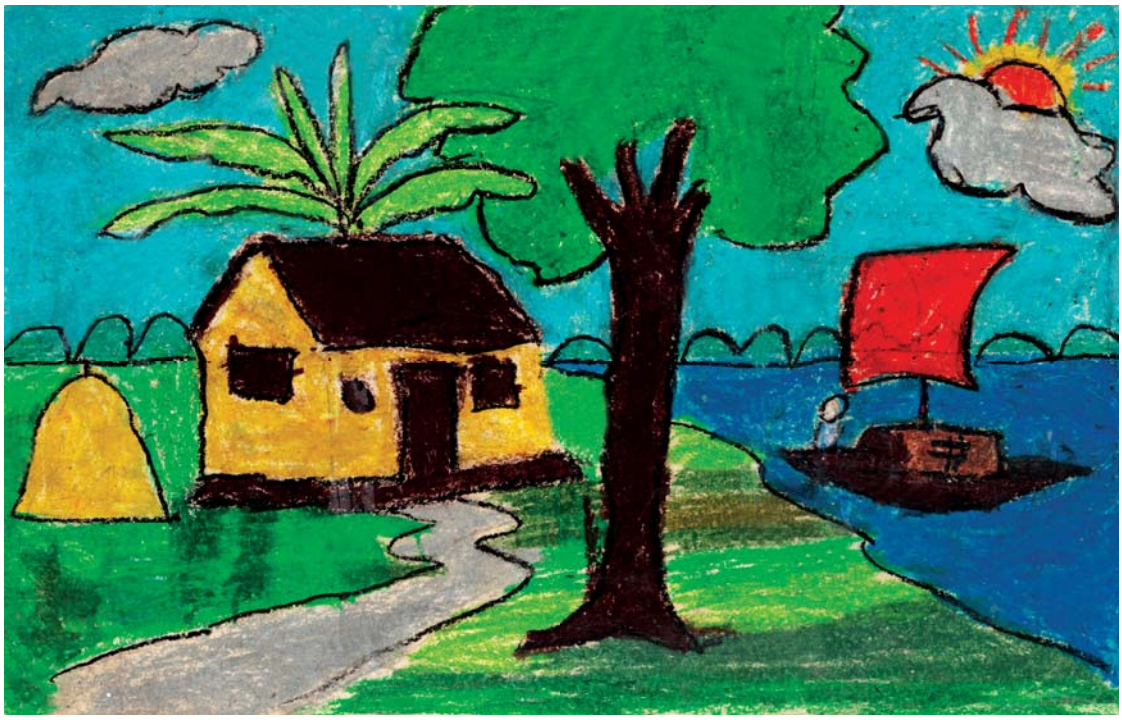

ইরিনা হক, পঞ্চম শ্রেণি, ইএসএস স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

মোছাঃ ফারিহা নওশিন সামিয়া, দ্বিতীয় শ্রেণি, হাজী আলাউদ্দিন রেসিডেন্সিয়াল স্কুল, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা

অনলাইন হুইল চেয়ার দাবা টুর্নামেন্ট

মো. আবু নাছের

ছোট্ট বন্ধুরা, করোনায় মাঠে খেলাধুলা একদম বন্ধ। সেজন্য বাসায় থেকে বড়োদের সাথে কেরাম, লুডু, মোবাইল গেমস খেলে সময় কাটছে। কেউবা আবার বাড়ির ছাদে বা আঙিনায় ঘুড়ি উড়িয়ে সময় পার করছি। আবার অনেকে অনলাইনেও বন্ধুদের সাথে মজার মজার খেলা খেলছি।

বন্ধুরা, এ সময় মাঠে কোনো খেলা না হলেও বাংলাদেশ হুইল চেয়ার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অনলাইন হুইলচেয়ার দাবা টুর্নামেন্ট-২০২০ আয়োজন করে। ২৫ ও ২৬শে জুলাই দুই দিনব্যাপী এ টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। ব্যতিক্রমী অনলাইন হুইল চেয়ার দাবা টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হন শেরপুরের আরিফ।

দুটি গ্রুপে ১০ জন প্রতিযোগীর মধ্যে রাউন্ড রবিন লিগ শেষে প্রতি গ্রুপ থেকে সর্বোচ্চ পয়েন্টধারী দুইজন করে মোট চারজন সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয়।

সেমিফাইনাল শেষে প্রথম সেমিফাইনালের বিজয়ী হেলাল এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালের বিজয়ী আরিফের মধ্যে ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ফাইনাল রাউন্ডে শেরপুরের প্রতিযোগী আরিফ চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্সআপ হয় পটুয়াখালীর হেলাল।

পুরো খেলাটি সম্প্রচার করা হয় 'বাংলাদেশ হুইলচেয়ার স্পোর্টস ফাউন্ডেশন অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজে'।

খেলা শেষে ফেসবুকে লাইভ সেশনে যুক্ত হন বাংলাদেশ হুইলচেয়ার স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হুইলচেয়ার ক্রীড়াবিদ নূর নাহিয়ান, রেডিও ভূমির প্রোগ্রাম কো-অরডিনেটর মাহবুব আলম ও বাংলাদেশ হুইলচেয়ার স্পোর্টস ফাউন্ডেশনের উপদেষ্টা বাংলা একাডেমির উপপরিচালক ড. আমিনুর রহমান সুলতান, এছাড়া চ্যাম্পিয়ন আরিফ ও রানার আপ বিজয়ী হেলাল। ■

অনলাইন দাবায় চ্যাম্পিয়ন আরিফ

নিবন্ধ

রেস্টুরেন্টে ঘুরছে রঙিন মাছ !

জোবায়ের হোসেন

এটি কোনো অ্যাকুরিয়াম না। নয় কোনো মাছের চৌবাচ্চা। তুমি চা কিংবা কফি খাচ্ছ অথবা চিকেন বা চাইনিজ খাবারের কোনো মেন্যু বেছে নিয়েছ। খেতে খেতে অনুভব করবে পায়ের পাতায় কিছু যেন চিমটি কাটল। নিচে তাকাতেই দেখতে পাবে পায়ের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানান রকম রঙিন মাছ।

এটি বিদেশের কোনো রেস্টুরেন্ট নয়। দেশেই এই অনুভূতি নিতে পারবে সাতক্ষীরা শহরতলির বকচরা বাইপাস সড়কের এই রেস্টুরেন্টে।

ব্যতিক্রমী এই রেস্টুরেন্ট পানির মধ্যেই পাতা রয়েছে চেয়ার-টেবিল। আর গোড়ালি পর্যন্ত পানিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ছোটো ছোটো বিভিন্ন রঙের মাছ। বিশেষ করে শিশুরা খুবই উপভোগ করছে এই পরিবেশ। আর বড়োদেরও হচ্ছে নতুন অভিজ্ঞতা। এসব অভিজ্ঞতার বর্ণনা ও ছবি সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে অনেকেই শেয়ার করছে।

রেস্টুরেন্টের মালিক বলেন, ইউটিউবের ভিডিও দেখে এই পরিকল্পনা মাথায় আসে। এই রেস্টুরেন্ট চালু হয়েছে ঈদুল আযহার দুই দিন আগে। ক্রেতাদের সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী জাহিদ হোসেন বলেন, ঢাকায় অনেক রেস্টুরেন্টে খেয়েছি। কিন্তু এই রকম ব্যতিক্রমী বিষয় আমার চোখে পড়েনি। সাতক্ষীরায় বাড়ির পাশে এই ব্যতিক্রম রেস্টুরেন্ট গড়ে উঠেছে। সত্যিই আমি অবাক হয়েছি।

তিনি আরো বলেন, খেতে খেতে কখনো অনুভব করছি পায়ের পাতায় কে যেন আদর করছে। নিচে তাকাতেই দেখি পা ছেড়ে পালিয়ে গেল রঙিন মাছটা। অসাধারণ অভিজ্ঞতা হলো এভাবে খাবার খেয়ে। এখানে এসে অনেক ভালো লেগেছে। ■

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. সপ্তাহের একটি দিন, ৩. গ্রামীণ শিশু-কিশোরদের একটি জনপ্রিয় খেলা, ৪. অমিল, ৬. বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় ঢাকার যে এলাকায় অবস্থিত, ৮. মেরুদন্ডী প্রাণীর একটি অঙ্গ যা শ্বাস-প্রশাসে ব্যবহৃত হয়

উপর-নিচ: ১. কুমিল্লা জেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান, ২. এক্সরে-র বাংলা শব্দ ৫. নুন, ৬. মস্তিষ্ক, ৭. জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের একটি কাব্যগ্রন্থ

■	১.				২.	■	■
■		■	■	■		■	■
৩.				■		■	■
■		■	■	৪.			৫.
৬.		৭.		■		■	
	■		■	■	■	■	
	■	৮.				■	■
■	■		■	■	■	■	■

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেয়া হলো।

সংকেত: উপসংহার, বিপদ, কানন, বাংলাদেশ, হাজার, গরহাজির, অনল, শহর, হল, জাত, জিত, গরল, বীর

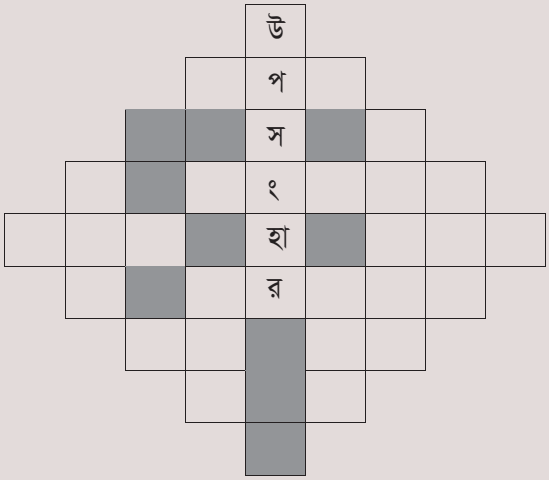

ব্রেইনইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৭	+		-	৮	=	
*	■	/	■	/	■	+
	+	৩	-		=	১
-	■	+	■	+	■	+
৬	+		-	৫	=	
=	■	=	■	=	■	=
	/	৪	+		=	৯

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিক ভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৪৭			৪৪	৩		৫		১৩
	৫১				৭		১১	
৪৯		৫৩		১		৯		
৫৬	৫৫		৪১		৩৯		২১	
	৬২		৭৮			২৩		
		৬৪		৮০			১৯	১৮
৫৯	৬০		৭৬	৮১		২৫		২৭
৬৮		৬৬			৩৫		৩১	
	৭০		৭২	৭৩		৩৩		২৯

মুজিববর্ষের ঘোষণা

বন্ধুরা, তোমাদের জন্য সুখবর। নবারুণের 'বুদ্ধিতে ধার দাও' এতদিন খেলে উত্তর পাঠিয়েছ কিন্তু কোনো উপহার পাওনি। এপ্রিল ২০২০ সংখ্যা থেকে শুরু হয়েছে উপহারের পালা। সঠিক উত্তর দাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ীকে দেওয়া হবে ৫০০ (পাঁচশত) টাকার প্রাইজবন্ড। এজন্য নবারুণ পত্রিকার পাতা (ফটোকপি প্রযোজ্য নয়) পূরণ করে বন্ধ খামে পাঠাতে হবে। খামের ওপর অবশ্যই লিখতে হবে 'বুদ্ধিতে ধার দাও'। পাঠাবে এই ঠিকানায়—

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড
ঢাকা-১০০০

বুদ্ধিতে ধার দাও

আগস্ট ২০২০ -এর সমাধান

শব্দধাঁধা

		শে					ই
		খ					স
		রা					লা
		সে					মি
গো	পা	ল	গ	ঞ্জ			য়া
					লা		ক
					হো		লে
মু	জি	ব	ন	গ	র		জ

ছক মিলাও

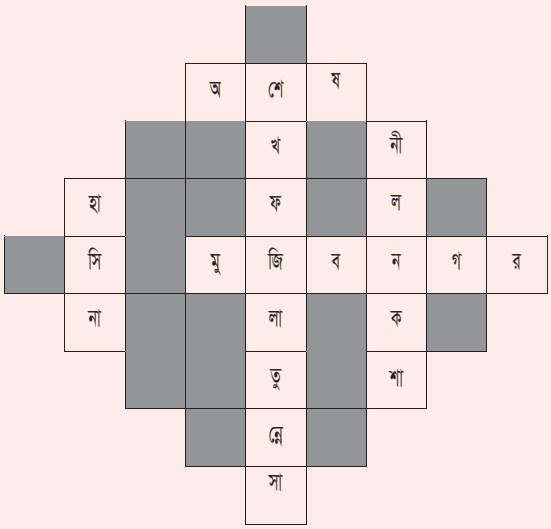

ব্রেইনইকুয়েশন

৬	*	২	-	৮	=	৪
+		*		/		/
৩	+	৫	-	৪	=	৪
-		-		+		+
৪	+	৬	-	৪	=	৬
=		=		=		=
৫	-	৪	+	৬	=	৭

নাম্ব্রিক্স

৫	৬	৯	১০	৩৭	৩৮	৩৯	৪০	৪১
৪	৭	৮	১১	৩৬	৫১	৫০	৪৯	৪২
৩	২	১	১২	৩৫	৫২	৫৩	৪৮	৪৩
১৬	১৫	১৪	১৩	৩৪	৫৫	৫৪	৪৭	৪৪
১৭	৩০	৩১	৩২	৩৩	৫৬	৫৭	৪৬	৪৫
১৮	২৯	২৮	৭৩	৭২	৭১	৫৮	৫৯	৬০
১৯	২৬	২৭	৭৪	৭৫	৭০	৬৯	৬৮	৬১
২০	২৫	২৪	৭৭	৭৬	৮১	৬৬	৬৭	৬২
২১	২২	২৩	৭৮	৭৯	৮০	৬৫	৬৪	৬৩

আলিফ হক, কেজি ওয়ান, স্টার হাতেখড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা

ইনান ইসলাম, দ্বিতীয় শ্রেণি, স্বপ্নকুড়ি কিন্ডারগার্টেন, মাভা, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট ও গ্রাহকগণ নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, তথ্যভবন
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৮৩০০৬৯৯
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-45, No-3, September 2020, Tk-20.00

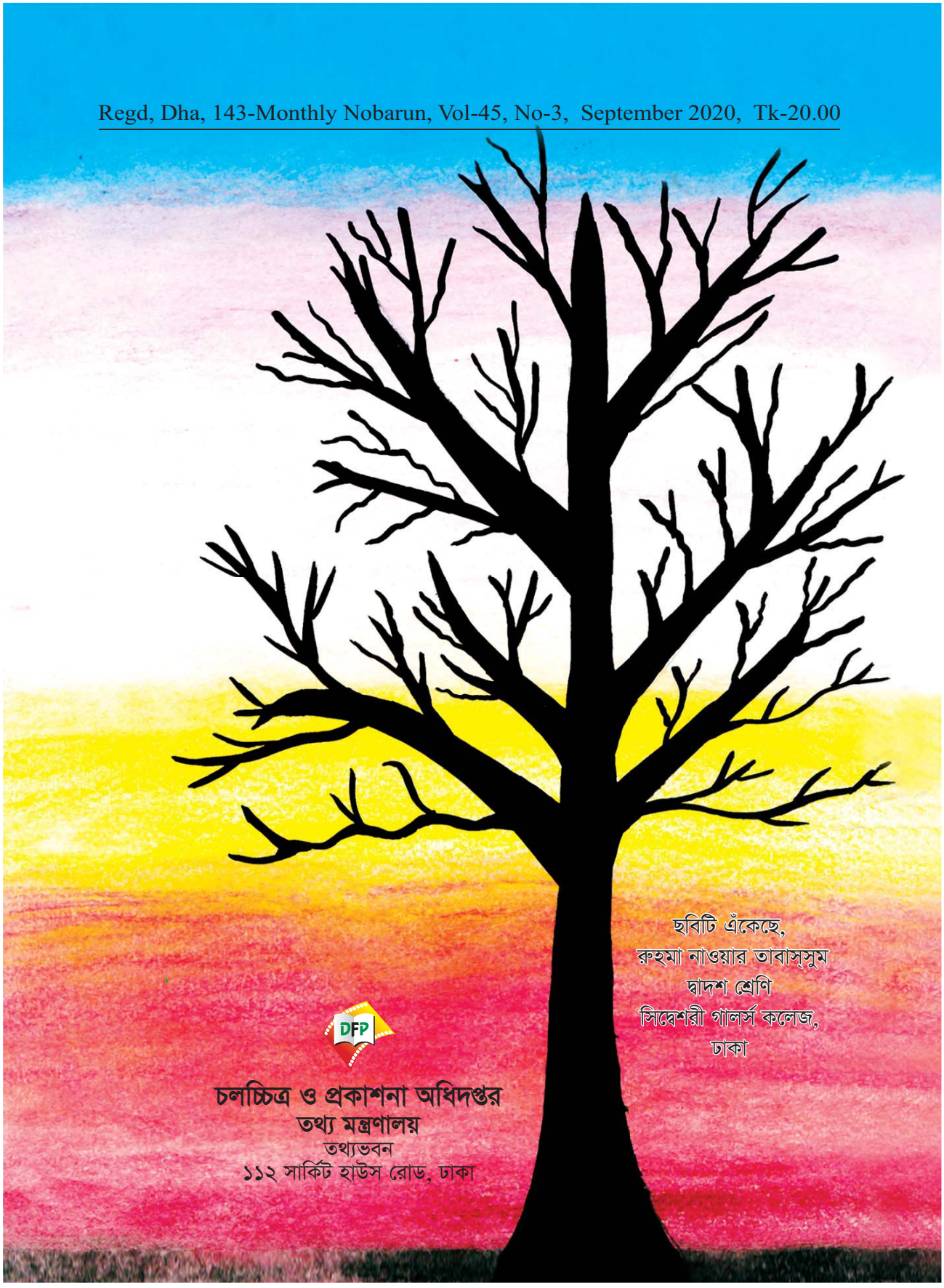

ছবিটি এঁকেছে,
রুহমা নাওয়ার তাবাস্‌সুম
দ্বাদশ শ্রেণি
সিদ্বেশ্বরী গার্লস কলেজ,
ঢাকা

DFP
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
তথ্যভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা